আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প

পরশুরাম

পরশুরাম-লিখিত
অন্যান্য গল্পের বই :

গড্ডলিকা ২·৫০
কজ্জলী ২·৫০
হনুমানের স্বপ্ন ২·৫০
গল্পকল্প ২·৫০
ধুস্তুরী মায়া ইত্যাদি গল্প ৩·০০
কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প ২·৫০
নীল তারা ইত্যাদি গল্প ৩·০০

আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প

পরশুরাম

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রকাশক :
শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম মুদ্রণ : পৌষ ১৮৭৯

মূল্য : তিন টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, প্রাইভেট লি.
৫, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা—৯

সূচী

আনন্দীবাঈ

বহু কারবারের মালিক ত্রিক্রমদাস করোড়ী তাঁর দিল্লির অফিসের খাস কামরায় বসে চেক সহি করছেন। আরদালী এসে একটা কার্ড দিল—এম. জুলফিকার খাঁ। ত্রিক্রমদাস বললেন, একটু সবুর করতে বল।

কিছুক্ষণ পরে সহি করা চেকের গোছা নিয়ে কেরানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ত্রিক্রমদাস ঘণ্টা বাজিয়ে আরদালীকে ডেকে কার্ডখানা দিয়ে বললেন, আসতে বল।

জুলফিকার খাঁ এসে বললেন, আদাব আরজ। শেঠজী, আমি ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ থেকে আসছি।

উদ্বিগ্ন হয়ে শেঠজী প্রশ্ন করলেন, ইনকমট্যাক্স নিয়ে আবার কিছু গড়বড় হয়েছে নাকি?

—তা আমার মালুম নেই। আমার ডিপার্টমেণ্টে আপনার নামে একটা সিরিয়স চার্জ এসেছে।

—কেন, আমার কসুর কি?

—আপনি তিনটি শাদি করেছেন।

একটু হেসে ত্রিক্রম বললেন, য়হ বাত? যদি করেই থাকি তাতে আমার কসুর কি? আমি তো হিন্দু, সৈকড়োঁ শাদি করতে পারি, আপনাদের মতন চারটি বিবিতে আটকে থাকবার দরকার নেই।

খাঁ সাহেব হাত নেড়ে বললেন, হায় হায় শেঠজী, আপনি রুপয়াই কামাতে জানেন, মুলুকের খবর রাখেন না। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন আর

শিখ একটির বেশী শাদি করতে পারবে না—এই আইন সম্প্রতি চালু হ'য়ে গেছে তা জানেন না?

—বলেন কি! আমি নানা ধান্দায় ব্যস্ত, সব খবর রাখবার ফুরসত নেই। নতুন ট্যাক্স কি বসল, নতুন লাইসেন্স কি নিতে হবে, এই সবেরই খোঁজ রাখি। কিন্তু আপনার খবরে বিশ্বাস হচ্ছে না, আমার ফুফা (পিসে) হরচন্দ্‌জী দুই জরু নিয়ে বহুত মজে মে আছেন, তাঁর নামে তো চার্জ আসে নি।

—আইন চালু হবার আগে থেকেই তো তাঁর দুই জরু আছে, তাতে দোষ হয় না। কিন্তু আপনি হালে তিন শাদি করেছেন, তার জন্যে কড়া সাজা হবে, দশ বৎসর জেল আর বিস্তর টাকা জরিমানা হতে পারে।

শেঠজী ভয় পেয়ে বললেন, বড়ী মুশকিল কি বাত, এখন এর উপায় কি?

—দেখুন শেঠজী, আপনি মান্যগণ্য আমীর আদমী, আপনাকে মুশকিলে ফেলতে আমরা চাই না। এক মাস সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে একটা বন্দোবস্ত করে ফেলুন।

—কত টাকা লাগবে?

—আপনি একটি জরুকে বহাল রেখে আর দুটিকে ঝটপট খারিজ করুন। তার জন্যে কত খেসারত দিতে হবে তা তো আমি বলতে পারি না, উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। আর এদিকে কত টাকা লাগবে সে তো আপনার আর আমার মধ্যে, তার কথা পরে হবে।

মাথা চাপড়ে ত্রিক্রমদাস বললেন, হো রামজী, হো পরমাত্মা, বাঁচাও আমাকে। একটিকে সনাতনী মতে বিবাহ করেছি, আর একটিকে আর্যসমাজী মতে, আর একটির সঙ্গে সিভিল ম্যারিজ হয়েছে। খারিজ করব কি করে?

—ঘবড়াবেন না শেঠজী, আপনার টাকার কমি কি? দু-চার লাখ খরচ করলে সব মিটে যাবে। দুটি স্ত্রীকে মোটা খেসারত দিয়ে কবুল করিয়ে নিন যে তারা আপনার অসলী জরু নয়, শুধু মুহব্বতী পিয়ারী। তার পর আমরা ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দেব। দেরি করবেন না, এখনই কোনও ভাল উকিল লাগান। আচ্ছা, আজ আমি উঠি, হপ্তা বাদ আবার দেখা করব। আদাব।

ত্রিক্রমদাসের বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশী। তাঁর বৈবাহিক ইতিহাস অতি বিচিত্র। দু বৎসর আগে তাঁর একমাত্র পত্নী কয়েকটি ছেলেমেয়ে রেখে মারা যান। তার কয়েক মাস পরে তিনি আনন্দীবাঈকে বিবাহ করেন। তার পর সম্প্রতি তিনি আরও দুটি বিবাহ করেছেন কিন্তু তার খবর আত্মীয়-বন্ধুদের জানান নি। এখনকার পত্নীদের প্রথমা আনন্দীবাঈ হচ্ছেন খজৌলি স্টেটের ভূতপূর্ব দেওয়ান হরজীবনলালের একমাত্র সন্তান, বহু ধনের অধিকারিণী। হরজীবন মারা গেলে তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাই অভিভাবক হয়ে ভাইঝিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু মেয়ের মামাদের সাহায্যে ত্রিক্রমদাস আনন্দীকে বিবাহ করে তাঁর সম্পত্তি নিজের দখলে আনলেন। আনন্দীবাঈএর বয়স আন্দাজ পঁচিশ, দেখতে ভাল নয়; একটু ঝগড়াটে, উচ্চবংশের অহংকারও আছে।

ত্রিক্রমদাসের ব্যবসার কেন্দ্র আর হেড অফিস দিল্লিতে, তা ছাড়া বোম্বাই আর কলকাতায় তাঁর যে ব্র্যাঞ্চ অফিস আছে তাও ছোট নয়। তিনি বৎসরে তিন-চার বার ওই দুই শাখা পরিদর্শন করেন। আনন্দীর সঙ্গে বিবাহের কিছুকাল পরে তিনি বোম্বাই যান। সেখানকার ম্যানেজার কিষনরাম খোবানী একদিন তাঁর মনিবকে নিমন্ত্রণ করে

নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন। তিনি সিন্ধের লোক, দেশ ত্যাগের পর দিল্লি চলে আসেন, তার পর শেঠজীর ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার হয়ে বোম্বাইএ বাস করছেন। কিষনরাম শৌখিন লোক, তাঁর ফ্ল্যাট বেশ সাজানো। তিনি তাঁর স্ত্রী আর শালীর সঙ্গে নিজের মনিবের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শেঠজী সেকেলে লোক, আধুনিক মহিলাদের সঙ্গে তাঁর মেশবার সুযোগ এ পর্যন্ত হয় নি। কিষনরামের শালী রাজহংসী ঝলকানীকে দেখে তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। কি ফরসা রং, কি সুন্দর সাজ! পরনে ফিকে নীল সালোয়ার আর ঘোর নীল কামিজ, তার উপর চুমকি বসানো ফিকে সবুজ দোপাট্টা ঝলমল করছে। কথাবার্তা অতি মধুর, কোনও জড়তা নেই, হেসে হেসে এটা খান ওটা খান বলে অনুরোধ করছে।

খাওয়া শেষ হল। কিষনরামকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে শেঠজী রাজহংসী ঝলকানীর সব খবর জেনে নিলেন। মেয়েটির বাপ মা নেই। একমাত্র ভাই সিংগাপুরে ভাল ব্যবসা করে, কিন্তু বোনের কোনও খবর নেয় না, অগত্যা কিষনরাম তাঁর শালীকে নিজের কাছে রেখেছেন। সে ভাল অভিনয় করতে পারে, গাইতে পারে, সিনেমায় নামবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু কিষনরাম ও তাঁর স্ত্রীর মত নেই।

শেঠজী তখনই মতি স্থির করে বললেন, আমার সঙ্গে রাজহংসীর বিবাহ দাও, ওকে আমি খুব সুখে রাখব। এই বোম্বাই শহরেই আমার জন্যে জলদি একটা বাড়ি কিনে ফেল, রাজহংসী সেখানে থাকবে, আমিও বৎসরের বেশীর ভাগ বোম্বাইএ বাস করব। এখানকার কারবার ফালাও করতে চাই।

আনন্দীবাঈএর কথা শেঠজী চেপে গেলেন। কিষনরাম জানতেন যে তাঁর মালিক বিপত্নীক, সুতরাং তিনি খুশী হয়ে সম্মতি দিলেন।

রাজহংসীও রাজী হলেন, শেঠজীর বেশী বয়সের জন্যে কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করলেন না। আর্যসমাজী পদ্ধতিতে বিবাহ হয়ে গেল। তার পর নূতন বাড়িও কেনা হল, রাজহংসী সেখানে বাস করতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে ত্রিক্রমদাস তাঁর কলকাতার কারবার পরিদর্শন করতে গেলেন। ওখানকার ম্যানেজার পরিতোষ হোড়-চৌধুরী খুব কাজের লোক, আলিপুরে সাহেবী স্টাইলে থাকেন। তিনি তাঁর মনিবকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে পরিতোষের স্ত্রী আর ভগ্নীর সঙ্গে ত্রিক্রমদাসের পরিচয় হল। মিস বলাকা হোড়-চৌধুরীকে দেখে শেঠজী অবাক হয়ে গেলেন। রাজ-হংসীর মতন রূপসী নয় বটে, কিন্তু শাড়ি পরবার ভঙ্গীটি কি চমৎকার, আর বাত-চিত আদব কায়দাও কি সুন্দর! মেমসাহেবদের মতন ইংরেজী উচ্চারণ করে, আর হিন্দী বলতে ভুল করে বটে কিন্তু সেই ভুল কি মিষ্টি! শেঠজী একেবারে কাবু হয়ে পড়লেন। পরিতোষ হোড়-চৌধুরী তাঁকে জানালেন, বলাকা এম. এ. পাস, নাচ-গানে কলকাতায় ওর জুড়ী নেই, সিনেমাওয়ালারা ওকে পাবার জন্যে সাধাসাধি করছে, কিন্তু পরিতোষের তাতে মত নেই। ত্রিক্রমদাস নিজেকে সামলাতে পারলেন না, বলে ফেললেন, মিস বলাকা, মৈ তুমকো শাদি করুংগা।

বলাকা সহাস্যে উত্তর দিলেন, তা বেশ তো, কিন্তু দিল্লির গরম তো আমার সইবে না, আর আপনাদের দাল-রোটি ভাজী দহিবড়া আমার হজম হবে না।

শেঠজী বললেন, আরে দিল্লি যেতে তোমাকে কে বলছে? আমি এই আলিপুরে একটা মোকাম কিনব, তুমি সেখানে তোমার দাদার কাছাকাছি বাস করবে। আমি বছরে আট-ন মাস এখানেই কাটাব,

কলকাতার কারবার ফলাও করতে চাই। তোমাকে দাল-রোটি খেতে হবে না, মচ্ছি-ভাতই খেয়ো। মচ্ছি খেতে আমিও নারাজ নই, কিন্তু বড় বদবু লাগে।

বলাকা বললেন, আমি গোলাপী আতর দিয়ে ইলিশ মাছ রেঁধে আপনাকে খাওয়াব, মনে হবে যেন কালাকন্দ খাচ্ছেন।

বলাকা তাঁর দাদার কাছে শুনেছিলেন যে শেঠজী বিপত্নীক। তিনি তখনই বিবাহে রাজী হলেন। কুড়ি দিন পরে সিভিল ম্যারিজ হয়ে গেল।

ত্রিক্রমদাস পালা করে দিল্লি থেকে বোম্বাই আর কলকাতা যেতে লাগলেন, তাঁর দাম্পত্যের ত্রিধারায় কোনও ব্যাঘাত ঘটল না, পরমানন্দে দিন কাটতে লাগল। তার পর অকস্মাৎ একদিন জুলফিকার খাঁ দুঃসংবাদ দিয়ে শেঠজীর শান্তিভঙ্গ করলেন।

উকিল খজনচাঁদ বি. এ, এল-এল. বি. ত্রিক্রমদাসের অনুগত বিশ্বস্ত বন্ধু, ইনকমট্যাক্সের হিসাব দাখিলের সময় তাঁর সাহায্য না নিলে চলে না। শেঠজী সেই দিনই সন্ধ্যার সময় খজনচাঁদের কাছে গিয়ে নিজের বিপদের কথা জানালেন।

খজনচাঁদ বললেন, শেঠজী, আপনি নিতান্ত ছেলেমানুষের মতন কাজ করেছেন। আমাকে আপনি বিশ্বাস করেন, কিন্তু ওই মুম্বই-বালী আর কলকাত্তাবালীকে কথা দেবার আগে একবার আমাকে জানালেন না, এ বড়ই আফসোস কি বাত।

শেঠজী হাত জোড় করে বললেন, মাফ কর ভাই, বুড়ো বয়সে একটা স্ত্রী থাকতে আরও দুটো বিয়ে করবার লোভ হয়েছে এ কথা লজ্জায় তোমাকে বলি নি। এখন উদ্ধারের উপায় বাতলাও।

কিছুক্ষণ ভেবে খজনচাঁদ বললেন, আনন্দীবাঈকে কিছু বলবার দরকার নেই, শুনলে উনি দুঃখ পাবেন, কান্নাকাটি করবেন। আর দুজনকে একে একে আপনি সব কথা খুলে বলুন। ওঁরা হচ্ছেন মডার্ন গার্ল, আত্মমর্যাদাবোধ খুব বেশী। আপনার কুকর্ম জানলে রেগে আগুন হবেন, আপনার মুখ দেখতে চাইবেন না। তাতে আমাদের সুবিধাই হবে, মোটা খেসারত দিলে আর আপনার দুই ম্যানেজারকে কিছু খাওয়ালে সব মিটে যাবে। দু-চার লাখ খরচ হতে পারে, কিন্তু আপনার তা গায়ে লাগবে না।

এই পরামর্শ ত্রিক্রমদাসের পছন্দ হল না। তিনি বললেন, খজন ভাই, তুমি আমার প্রাণের কথা বুঝতে পারছ না। আমি বিজনেস বাড়াতে চাই, তার জন্যে নামজাদা লোকের সঙ্গে মেশা দরকার। আমি যদি মন্ত্রী আর বড় বড় অফিসারদের পার্টি দিই তবে আমার বাড়ির কোন্ লেডী অতিথিদের আপ্যায়িত করবে? আনন্দী? রাম কহো। রাজহংসী আর বলাকা হচ্ছে এই কাজের কাবিল। বাতিল করতে হলে আনন্দীকেই করতে হবে। তাতে আমার কলিজা ফেটে যাবে, অনেক টাকার সম্পত্তিও ছাড়তে হবে, কিন্তু তার জন্যে আমি প্রস্তুত আছি। মুশকিল হচ্ছে—রাজহংসী আর বলাকার মধ্যে কাকে রাখব কাকে ছাড়ব তা স্থির করা বড় শক্ত, তবে আমার বেশী পছন্দ কলকাত্তাবালী বলাকা দেবী। ওকে যদি নিতান্ত না রাখতে পারি তবে ওই মুম্বইবালী রাজহংসী। টাকার জন্যে ভেবো না, দশ-পনেরো লাখ তক খরচ করতে আমি তৈয়ার আছি।

খজনচাঁদ অনেক বোঝালেন যে আনন্দীবাঈ তাঁর আইনসম্মত স্ত্রী, তাঁর দাবী সকলের উপরে। তাঁকে ত্যাগ করতে হলে অনেক জুয়াচুরির দরকার হবে, তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি ছেড়ে দিতে হবে, তার ফলে মোট লোকসান খুব বেশী হবে, আনন্দীবাঈএর সেই বদমাশ

কাকার শরণাপন্ন হতে হবে। কিন্তু ত্রিক্রমদাস কিছুতেই তাঁর সংকল্প ছাড়লেন না। অগত্যা খজনচাঁদ বললেন, বেশ, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনি দেরি না করে তিনজনকেই সব কথা খুলে বলুন। ওঁদের মনের ভাব দেখে আমি যা করবার করব।

কালবিলম্ব না করে ত্রিক্রমদাস এয়ারোপ্লেনে বোম্বাই গেলেন এবং সোজা রাজহংসীর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। রাজহংসী তাঁর ড্রইংরুমে বসে একটি সুবেশ যুবকের সঙ্গে গল্প করছিলেন। আশ্চর্য হয়ে বললেন, আরে শেঠজী হঠাৎ এলে যে! কোনও খবর দাও নি কেন? এঁকে তুমি চেন না, ইনি হচ্ছেন মিস্টার ঝুমকমল মটকানি, দূর সম্পর্কে আমার ফুফেরা (পিসতুতো) ভাই হন, হিসাবের কাজে ওস্তাদ। এখানকার অফিসের অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট তো বুড়ো হয়েছে, তাকে বিদায় করে এই ঝুমকমলকে সেই পোস্টে বসাও।

ত্রিক্রমদাস বললেন, আমি ভেবে দেখব। রাজহংসী, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

ঝুমকমল চলে গেলে ত্রিক্রমদাস ভয়ে ভয়ে তাঁর তিন বিবাহের কথা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তার রিঅ্যাকশন যা হল তা একেবারে অপ্রত্যাশিত। রাজহংসী হেসে গড়িয়ে পড়ে বললেন, বাহবা শেঠজী, তুমি দেখছি বহুত রঙ্গীলা আদমী! তোমার আরও দুই জরু আছে তাতে হয়েছে কি, আমি ওসব গ্রাহ্য করি না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সব ঠিক হৈ। তবে কথাটা যেন জানাজানি না হয়।......হ্যাঁ, ভাল কথা, এই বাড়িটা জলদি আমার নামে রেজিস্টারি করা দরকার, মিউনিসিপ্যালিটি বড় হয়রান করছে।

শেঠজী বললেন, আচ্ছা, তার ব্যবস্থা হবে। আজ আমি থাকতে পারব না, জরুরী কাজে এখনই কলকাতা রওনা হব।

কলকাতায় পেঁাছে ত্রিক্রমদাস সোজা আলিপুরে বলাকার কাছে গেলেন। ড্রইংরুমে একজন সুদর্শন ভদ্রলোক পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন আর বলাকা তালে তালে নাচছিলেন। ত্রিক্রমকে দেখে বলাকা বললেন, একি শেঠজী, হঠাৎ এলে যে! এঁকে বোধ হয় চেন না, ইনি হচ্ছেন লোটনকুমার ভড়, দূর সম্পর্কে আমার মাসতুতো ভাই, নাচের ওস্তাদ। এঁর কাছে আমি কবুতর-নৃত্য শিখছি। দেখবে একটু?

ত্রিক্রম বললেন, এখন আমার ফুরসত নেই। বলাকা, তোমার সঙ্গে আমার বহুত জরুরী কথা আছে।

লোটনকুমার উঠে গেলে ত্রিক্রমদাস কম্পিত বক্ষে তাঁর তিন বিবাহের কথা প্রকাশ করলেন। বলাকা গালে আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, ওমা তাই নাকি! ওঃ শেঠজী, তুমি একটি আসল পানকৌড়ি, নটবর নাগর। তা তুমি অমন মুষড়ে গেছ কেন, তিনটে বউ আছে তো হয়েছে কি? ঠিক আছে, তুমি ভেবো না, আমি হিংসুটে মেয়ে নই। কিন্তু তুমি যেন সবাইকে বলে বেড়িয়ো না।......হ্যাঁ, ভাল কথা, দেখ শেঠজী, একটা নতুন মোটরকার না হলে চলছে না, পুরনো অস্টিনটা হরদম বিগড়ে যাচ্ছে। তুমি হাজার কুড়ি টাকার একটা চেক আমাকে দিও, তার কমে ভাল গাড়ি মিলবে না।

ত্রিক্রমদাস বললেন, আচ্ছা, তার ব্যবস্থা হবে। আমি এখন উঠি, আজই দিল্লি যেতে হবে।

ত্রিক্রমদাস দিল্লিতে এসেই খজনচাঁদের কাছে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। তার পর তাঁকে সঙ্গে করে নিজের বাড়িতে এনে ড্রইংরুমে অপেক্ষা করতে বললেন।

অন্দরমহলে গিয়ে ত্রিক্রম আনন্দীবাঈকে শোবার ঘরে ডেকে আনালেন। আনন্দী বললেন, তিন দিন তোমার কোনও পাত্তা নেই, চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, ব্যাপার কি, গভরমেণ্টের সঙ্গে আবার কিছু গড়বড় হয়েছে নাকি?

ত্রিক্রমদাস মাথা হেঁট করে তাঁর গুপ্তকথা প্রকাশ করলেন। আনন্দী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তার পর কোমরে হাত দিয়ে চোখ পাকিয়ে বললেন, ক্যা বোলা তুম নে?

শেঠজী একটু ভয় পেয়ে বললেন, আনন্দী, ঠাণ্ডা হো যাও, সব ঠিক হো জাগা।

বাংলা সাহিত্য যতই সমৃদ্ধ আর উঁচুদরের হক, হিন্দী ভাষায় গালাগালির যে শব্দসম্ভার আছে তার তুলনা নেই। আনন্দীবাঈ হাত-পা ছুড়ে নাচতে লাগলেন, হোজ-পাইপ থেকে জলধারার মতন তাঁর মুখ থেকে যে ভর্ৎসনা নির্গত হতে লাগল তা যেমন তীব্র তেমনি মর্মস্পর্শী। তার সকল বাক্য ভদ্রজনের শ্রোতব্য নয়, ভদ্রনারীর উচ্চার্যও নয়, কিন্তু আনন্দীবাঈএর তখন হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে। তিনি উত্তরোত্তর উত্তেজিত হচ্ছেন দেখে শেঠজী হাত জোড় করে আবার বললেন, আনন্দী, মাফ করো, সব ঠিক হো জাগা।

আনন্দী গর্জন করে বললেন, চোপ রহো শড়ক কা কুত্তা, ডিরেন কা ছুছুন্দর! এই বলেই বাঘিনীর মতন লাফিয়ে গিয়ে শেঠজীর দুই গালে থামচে দিলেন। তার পর পিছু হটে তাঁর বাঁ হাত থেকে দশগাছা মোটা মোটা চুড়ি খুলে নিয়ে স্বামীর মস্তক লক্ষ্য করে ঝনঝন শব্দে নিক্ষেপ করলেন। শেঠজীর কপাল ফেটে রক্ত পড়তে লাগল, তিনি চিৎকার করে ধরাশায়ী হলেন। ততোধিক চিৎকার করে আনন্দীবাঈ তাঁর পুজোর ঘরে চলে গেলেন এবং মেঝেয় শুয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বাড়িতে মহা শোরগোল পড়ে গেল। আত্মীয়া যাঁরা ছিলেন তাঁরা আনন্দীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। শেঠজীর জন্যে খজনচাঁদ তখনই ডাক্তার ডেকে আনালেন।

সাত দিন পরে শেঠজী অনেকটা সুস্থ হয়েছেন এবং দোতলার বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে গুড়গুড়ি টানছেন। তাঁর মাথায় এখনও ব্যাণ্ডেজ আছে, মুখে স্থানে স্থানে স্টিকিং প্লাসটারও আছে।

খজনচাঁদ এসে বললেন, কহিএ শেঠজী, তবিয়ত কৈসী হৈ।

শেঠজী বললেন, অনেক ভাল। শোন খজন-ভাই, রাজহংসী আর বলাকার সঙ্গে আমি সম্পর্ক রাখতে চাই না। তুমি তুরন্ত বোম্বাই আর কলকাতায় গিয়ে একটা মিটমাট করে ফেল, যত টাকা লাগে আমি দেব। ওই মুম্বইবালী আর কলকাত্তাবালী শুধু আমার টাকা চায়, আমাকে চায় না, কিন্তু আনন্দী আমাকেই চায়। খুশবু পাচ্ছ? আনন্দী নিজে আমার জন্যে ড়হর ডালের খিচ্ড়ি বানাচ্ছে। আর এই দেখ, গলাবন্ধ বুনে দিয়েছে।

খজনচাঁদ বললেন, বহুত খুশি কি বাত। শেঠজী, ভাববেন না, আমি সব ঠিক করে দেব। আপনি আনন্দীবাঈকে মথুরা বৃন্দাবন দ্বারকায় ঘুরিয়ে আনুন, তাঁর মেজাজ ভাল হয়ে যাবে।

পত্নীর সেবায় ত্রিক্রমদাস শীঘ্র সেরে উঠলেন। খজনচাঁদের চেষ্টায় রাজহংসী আর বলাকার সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেছে, জুলফিকার খাঁও পান খাবার জন্যে মোটা টাকা পেয়েছেন। কলকাতার সব চেয়ে বড় জ্যোতিষসম্রাট জ্যোতিষচন্দ্র জ্যোতিষার্ণবের কাছ থেকে আনন্দীবাঈ হাজার টাকা দামের একটি বশীকরণ কবচ আনিয়ে স্বামীর গলায়

বেঁধে দিয়েছেন। এই পুরশ্চরণসিদ্ধ কবচের ফলও আশ্চর্য। শেঠজী আজকাল তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুদের কাছে বলে থাকেন, সিবায় আনন্দী সব আওরত চুড়েল হৈ—অর্থাৎ আনন্দী ছাড়া সব স্ত্রীলোকই পেতনী।

(একটি ইংরেজী গল্পের প্লটের অনুসরণে। লেখকের নাম মনে নেই।)

১৮৭৮

চাঙ্গায়নী সুধা

ক্যালকাটা টি ক্যাবিনের নাম নিশ্চয় আপনাদের জানা আছে, নূতন দিল্লির গোল মার্কেটের পিছনের গলিতে কালীবাবুর সেই বিখ্যাত চায়ের দোকান।

বিজয়াদশমী, সন্ধ্যা সাতটা। পেনশনভোগী বৃদ্ধ রামতারণ মুখুজ্যে, স্কুল মাষ্টার কপিল গুপ্ত, ব্যাংকের কেরানী বীরেশ্বর সিংগি, কাগজের রিপোর্টার অতুল হালদার প্রভৃতি নিয়মিত আড্ডাধারীরা সকলেই সমবেত হয়েছেন। বিজয়ার নমস্কার আর আলিঙ্গন যথারীতি সম্পন্ন হয়েছে, এখন জলযোগ চলছে। কালীবাবু আজ বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন—চায়ের সঙ্গে চিঁড়ে ভাজা ফুলুরি নিমকি আর গজা।

অতুল হালদার বললেন, আজকের ব্যবস্থা তো কালীবাবু ভালই করেছেন, কিন্তু একটি যে ত্রুটি রয়ে গেছে, কিঞ্চিৎ সিদ্ধির শরবত থাকলেই বিজয়ার অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

রামতারণ মুখুজ্যে বললেন, তোমাদের যত সব বেয়াড়া আবদার। চায়ের দোকানে সিদ্ধির শরবত কি রকম? সিদ্ধি হল একটি পবিত্র বস্তু, যার শাস্ত্রীয় নাম ভঙ্গা বা বিজয়া। কালীবাবুর এই দোকান তো পাঁচ ভূতের হাট, এখানে সিদ্ধি চলবে না। দেবীর বিসর্জনের পর মঙ্গলঘট আর গুরুজনদের প্রণাম করে শুদ্ধচিত্তে সিদ্ধি খেতে হয়। আমি তো বাড়িতেই একটু খেয়ে নিয়ম রক্ষা করে তবে এখানে এসেছি।

একজন সাধুবাবা টি-ক্যাবিনে প্রবেশ করলেন। ছ ফুট লম্বা মজবুত গড়ন, কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা চুল, মোটা গোঁফ, কোদালের মতন

কাঁচা-পাকা দাড়ি, কপালে ভস্মের ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় কান ঢাকা গেরুয়া টুপি, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, পায়ে গেরুয়া ক্যামবিসের জুতো, হাতে একটি অ্যালুমিনিয়মের প্রকাণ্ড কমণ্ডলু বা হাতলযুক্ত বদনা। আগন্তুক ঘরে এসেই বাজখাঁই গলায় বললেন, নমস্তে মশাইরা, খবর সব ভাল তো?

কপিল গুপ্ত বললেন, আরে বকশী মশাই যে, আসতে আজ্ঞা হ'ক।* দু বছর দেখা নেই, এতদিন ছিলেন কোথায়? ভোল ফিরিয়েছেন দেখছি, সাধু মহারাজ হলেন কবে থেকে? বাঃ, দাড়িটিতে দিব্বি পার্মানেণ্ট ওয়েভ করিয়েছেন! কত খরচ পড়ল?

রামতারণ মুখুজ্যে বললেন, শোন হে জটাধর বকশী, দু-দু বার ঠকিয়ে গেছ, এবারে আর তোমার নিস্তার নেই, পুলিসে দেব।

অতুল হালদার বললেন, হুঁ হুঁ বাবা, দু-দু বার ঘুঘু তুমি খেয়ে গেছ ধান, এই বার ফাঁদে ফেলে বধিব পরান।

কপিল গুপ্ত বললেন, আহা, ভদ্রলোককে একটু হাঁফ ছেড়ে জিরুতে দিন, এঁর সমাচার সব শুনুন, তার পর পুলিস ডাকবেন। ও কালীবাবু, বকশী মশাইকে চা আর খাবার দাও, আমার অ্যাকাউণ্টে।

রবি বর্মার ছবিতে যেমন আছে—মেনকার কোলে শিশু শকুন্তলাকে দেখে বিশ্বামিত্র মুখ ফিরিয়ে হাত নাড়ছেন—সেই রকম ভঙ্গী করে জটাধর বললেন, না না, আর লজ্জা দেবেন না, আপনাদের ঢের খেয়েছি, এখন আমাকেই সেই ঋণ শোধ করতে হবে।

রামতারণ বললেন, তোমার অচলার কি খবর, সেই যাকে বিধবা বিবাহ করেছিলে?

ফোঁস করে একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জটাধর বললেন, তার

---

* জটাধর বকশীর পূর্বকথা 'কৃষ্ণকলি' ও 'নীল তারা' গ্রন্থে আছে।

কথা আর বলবেন না মুখুজ্যে মশাই, মনে বড় ব্যথা পাই। অচলা তার আগেকার স্বামী বলহরির সঙ্গেই চলে গেছে। বলহরি তাকে জোর করে নিয়ে গেছে, আমার পঞ্চাশটা টাকাও ছিনিয়ে নিয়েছে, অচলার জন্যে এখান থেকে যে খানকতক চপ নিয়ে গিয়েছিলুম তাও সেই রাক্ষসটা কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে।

কপিল গুপ্ত বললেন, যাক, গতস্য অনুশোচনা নাস্তি, এখন আপনার সন্ন্যাসের ইতিহাস বলুন। আহা, লজ্জা করছেন কেন, চা আর খাবার খেতে খেতেই বলুন, আমরা শোনবার জন্যে সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। ওহে কালীবাবু, বকশী মশাইকে আরও এক পেয়ালা চা আর এক প্লেট খাবার দাও, গোটা দুই বর্মা চুরুটও দাও, সব আমার খরচায়।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে জটাধর বললেন, নেহাতই যদি শুনতে চান তো বলছি শুনুন। অচলা চলে যাবার পর মনে একটা দারুণ বৈরাগ্য এল, সংসারে ঘেন্না ধরে গেল। দুত্তোর বলে একটি তীর্থযাত্রী দলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। ঘুরতে ঘুরতে মানস সরোবর কৈলাস পর্বতে এসে পৌঁছুলুম। সেখানে হঠাৎ কানহাইয়া বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁর পূর্বনাম কানাই বটব্যাল, খুব বড় সায়েণ্টিস্ট ছিলেন, অনেক রকম কারবারও এককালে করেছেন। শেষ বয়সে বিবাগী হয়ে হিমালয়ের একটি গুহায় পাঁচটি বৎসর তপস্যা করে সিদ্ধ হয়েছেন। আমার সঙ্গে পূর্বে একটু পরিচয় ছিল, দেখা মাত্র চিনে ফেললেন। তাঁর পা ধরে আমার দুঃখের সব কথা তাঁকে নিবেদন করলুম। কানু ঠাকুর বললেন, ভেবো না জটাধর, নিষ্কাম হয়ে কর্মযোগ অবলম্বন কর, আমার শিষ্য হও। আমি সংকল্প করেছি এই মানস সরোবরের তীরে একটি বড় মঠ প্রতিষ্ঠা করব, তাতে যাত্রীরা আশ্রয় পাবে। তিব্বত সরকারের পারমিশন পেয়েছি, দালাই লামা তাসী লামা পঞ্চেন লামা

সবাই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমি চাঁদা সংগ্রহের জন্য পর্যটন করব, তুমি সঙ্গে থেকে আমাকে সাহায্য করবে। কানু মহারাজের কথায় আমি তখনই রাজী হলুম। তার পর প্রায় বছর খানিক তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করেছি, হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত। মঠের জন্যে গরিব বড়লোক সবাই চাঁদা দিয়েছে, যার যেমন সামর্থ্য, এক আনা থেকে এক লাখ পর্যন্ত। তা টাকা মন্দ ওঠে নি, প্রায় পৌনে চার লাখ, সবই ইন্ডো-টিবেটান যক্ষ ব্যাংকে জমা আছে। কানু মহারাজ সম্প্রতি দিল্লিতেই অবস্থান করছেন, দরিয়াগঞ্জে শেঠ গজাননজীর কুঠীতে। তাঁর অনুমতি নিয়ে একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এলুম।

রামতারণ বললেন, আমরা কেউ এক পয়সা চাঁদা দেব না তা আগেই বলে রাখছি। তোমাকে থোড়াই বিশ্বাস করি।

জটাধর বকশী প্রসন্ন বদনে বললেন, মুখুজ্যে মশাইএর কথাটি হুঁশিয়ার জ্ঞানযোগীরই উপযুক্ত। বিশ্বাস করবেন কেন, আমার ভালোর দিকটা তো দেখেন নি। অদৃষ্টের দোষে বিপাকে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি, আপনাদের কাছে অপরাধী হয়ে পড়েছি, সে কথা আমিই কি ভুলতে পারি? সৎকার্যের জন্যে চাঁদা, বিশেষ করে মঠ নির্মাণের জন্যে চাঁদা শ্রদ্ধার সঙ্গে দিতে হয়। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্—এই হল শাস্ত্র-বচন। শ্রদ্ধা না হলে দেবেন কেন, আমিই বা চাইব কেন?

অতুল হালদার বললেন, থ্যাংক ইউ জটাই মহারাজ, আপনার বাক্যে আশ্বস্ত হলুম। মঠ প্রতিষ্ঠার কথা শুনেই আতঙ্ক হয়েছিল এখনই বুঝি চাঁদা চেয়ে বসবেন, না দিলে কানহাইয়া বাবার শাপের ভয় দেখাবেন। যাক, শ্রদ্ধা যখন নাস্তি তখন চাঁদাও নবডঙ্কা। আপনার ওই বিরাট বদনাটায় কি আছে?

জটাধর বললেন, বদনা বলবেন না। এর নাম রুদ্র কমণ্ডলু, কানু

মহারাজের ফরমাশে গজানন শেঠজী বানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর অ্যালু-মিনিয়মের কারখানা আছে কিনা।

রামতারণ প্রশ্ন করলেন, কি আছে ওটাতে? চলবল করছে যেন।

—আজ্ঞে, এতে আছে চাঙগায়নী সুধা, আপনাদের জন্যেই এনেছি।

রামতারণ বললেন, মৃতসঞ্জীবনী সুধা জানি, চাঙগায়নী আবার কি?

—এ এক অপূর্ব বস্তু মুখুজ্যে মশাই, কানু মহারাজের মহৎ আবিষ্কার। খেলে মন প্রাণ চাঙগা হয় তাই চাঙগায়নী সুধা নাম।

—মদ নাকি?

—মহাভারত! কানু মহারাজ মাদক দ্রব্য স্পর্শ করেন না, চা পর্যন্ত খান না। চাঙগায়নীতে কি আছে শুনবেন? আপনাদের আর জানাতে বাধা কি, কিন্তু দয়া করে ফরমুলাটি গোপন রাখবেন।

কপিল গুপ্ত বললেন, ভয় নেই বকশী মশাই, আমরা এই ক জন ছাড়া আর কেউ টের পাবে না।

—তবে শুনুন। এতে আছে কুড়িটি কবরেজী গাছ-গাছড়া, কুড়ি রকম ডাক্তারী আরক, কুড়ি রকম হোমিও গ্লোবিউল, কুড়ি দফা হেকিমী দাবাই, তা ছাড়া তান্ত্রিক স্বর্ণভস্ম হীরকভস্ম বায়ুভস্ম ব্যোমভস্ম, রাজ্যের ভিটামিন, আর পোয়াটাক ইলেকট্রিসিটি। আর আছে হিমালয়জাত সোমলতা, যাকে আপনারা সিদ্ধি বলেন, আর কাশ্মীরী মকরন্দ। এই সব মিশিয়ে বকযন্ত্রে চোলাই করে প্রস্তুত হয়েছে। কানু ঠাকুর বলেন, এই চাঙগায়নী সুধাই হচ্ছে প্রাচীন ঋষিদের সোমরস, উনি শুধু ফরমুলাটি যুগোপযোগী করেছেন।

অতুল হালদার ঊরুতে চাপড় মেরে বললেন, আরে মশাই এই রকম জিনিসই তো আজ দরকার। একটু আগেই বলেছিলুম কিঞ্চিৎ সিদ্ধির শরবত হলেই আমাদের এই বিজয়া সম্মিলনীটি নিখুঁত হয়।

রামতারণ বললেন, অত ব্যস্ত হয়ো না হে অতুল, জটাধরের চাঙগায়নী যে নেশার জিনিস নয় তা জানলে কি করে?

জটাধর বকশী তাঁর প্রকাণ্ড জিহ্বাটি দংশন করে বললেন, কি যে বলেন মুখুজ্যে মশাই! নেশার জিনিস কি আপনাদের জন্যে আনতে পারি, আমার কি ধর্মজ্ঞান নেই? এতে সিদ্ধি আছে বটে, কিন্তু তা মামুলী ভাঙ নয়, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শোধন করে তার মাদকতা একেবারে নিউট্রালাইজ করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যাকে বলে হৃদ্য বৃষ্য বল্য মেধ্য, এই চাঙগায়নী হল তাই। খেলে শরীর চাঙগা হবে, ইন্দ্রিয় আর বুদ্ধি তীক্ষ্ন হবে, চিত্তে পুলক আসবে, সব গ্লানি আর অশান্তি দূর হবে। কপিলবাবু, একটু ট্রাই করে দেখুন না। চায়ের বাটিটা আগে ধুয়ে নিন, জিনিসটি খুব শুদ্ধভাবে খেতে হয়।

কপিল গুপ্ত তাঁর চায়ের বাটি ধুয়ে এগিয়ে ধরে বললেন, খুব একটুখানি দেবেন কিন্তু। এই সিকিটি দয়া করে গ্রহণ করুন, আপনার কানহাইয়া মঠের জন্যে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য।

সিকিটি নিয়ে জটাধর তাঁর দশসেরী রুদ্রকমণ্ডলুর ঢাকনি খুললেন। ভিতর থেকে একটি ছোট হাতা বার করে তারই এক মাত্রা কপিল গুপ্তর বাটিতে ঢেলে দিয়ে বললেন, শ্রদ্ধয়া পেয়ম্।

অতুল হালদার বললেন, আমাকেও একটু দাও হে জটাধর মহারাজ। এই নাও দুটো দোয়ানি।

বীরেশ্বর সিংগিও চার আনা দক্ষিণা দিয়ে এক হাতা নিলেন। চেখে বললেন, চমৎকার বানিয়েছেন জটাধরজী, অনেকটা কোকা-কোলার মতন।

অতুল হালদার বললেন, দূর মুখ্খু, কিসের সংগে কিসের তুলনা! সেদিন হংগেরিয়ান এমবাসির পার্টিতে মিল্কপঞ্চ খেয়েছিলুম,

তার আগে ফ্রেঞ্চ কনসলের ডিনারে শ্যাম্পেনও খেয়েছি, কিন্তু এই চাঙগায়নী সুধার কাছে সে সব লাগে না। ওঃ, কি চীজই বানিয়েছ জটাই বাবা! মিষ্টি টক নোনতা ঝাল, ঈষৎ তেতো, ঈষৎ কষা, সব রসই আছে, কিন্তু প্রত্যেকটি একবারে লাগসই। ঝাঁজও বেশ, বোধ হয় ইলেকট্রিসিটির জন্যে, পেটে গিয়ে চিনচিন করে শক দিচ্ছে। দাও হে আর এক হাতা।

রামতারণ মুখুজ্যে বললেন, আমার আবার বাতের ব্যামো, ডায়াবিটিসও একটু আছে। চাঙগায়নী একটু খেলে বেড়ে যাবে না তো হে জটাধর?

জটাধর বললেন, বাড়বে কি মশাই, একেবারে নির্মূল হবে, শরীরের সমস্ত ব্যাধি, মনের সমস্ত গ্লানি, হৃদয়ের যাবতীয় জ্বালা বেমালুম ভ্যানিশ করবে। মুখ হাঁ করুন তো, এক হাতা ঢেলে দিচ্ছি, ভক্তিভরে সেবন করুন। শ্রদ্ধয়া পেয়ং, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্।

—নাঃ, তুমি দেখছি বেজায় নাছোড়বান্দা, কিছু আদায় না করে ছাড়বে না। নাও, পুরোপুরি একটা টাকাই নাও।

বৃদ্ধ রামতারণ মুখুজ্যের সদ্দৃষ্টান্তে সকলেই উৎসাহিত হয়ে চাঙগায়নী সেবন করলেন। তিন হাতা খাবার পর বীরেশ্বর সিংগি কাঁদোকাঁদো হয়ে বললেন, জটাধরজী, আমার মনে সুখ নেই, বড় কষ্ট, বড় অপমান, বউটা হরদম বলে, বোকারাম হাঁদারাম ভ্যাবাগঙগারাম।

জটাধর বললেন, আর একটু চাঙগায়নী খান বীরেশ্বরবাবু, সব দুঃখ ঘুচে যাবে। আপনি হলেন বীরপুংগব পুরুষসিংহ, কার সাধ্য আপনার অপমান করে! বোকারাম বললেই হল! দেখবেন আজ থেকে আর বলবে না, সবাই আপনাকে ভয় করবে।

রামতারণ বললেন, ওহে জটায়ু পক্ষী, তোমার চাঙগায়নী সত্যিই

খাসা জিনিস। এই নাও দু টাকা, একটু বেশী করে দাও তো। গিন্নী কেবলই বলে, বাহাত্তুরে বেআক্কেলে বুড়ো, ভীমরতি ধরেছে। মাগী আমাকে ভালমানুষ পেয়ে গ্রাহ্যির মধ্যে আনে না, বড়লোকের বেটী বলে ভারী দেমাক। আরে বাপের কত টাকা আমার ঘরে এনেছিস? আজ বাড়ি গিয়ে দেখে নেব, বেশ একটু তেজ পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে।

জটাধর বললেন, এই চাঙগায়নীতে সৌরতেজ রুদ্রতেজ ব্রহ্মতেজ সব আছে মুখুজ্যে মশাই। আপনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, ঋষিদের বংশধর, আপনার পূর্বপুরুষরা সোমযাগ করতেন, কলসী কলসী সোমরস খেতেন। আপনার আবার তেজের ভাবনা! নিন, চায়ের পেয়ালা ভরতি করে দিলুম, চোঁ করে গলাধঃকরণ করে ফেলুন। পাঁচ টাকা দক্ষিণা—শ্রদ্ধয়া দেয়ং, শ্রদ্ধয়া পেয়ম্।

কালীবাবুর টি ক্যাবিনে যারা উপস্থিত ছিলেন তার সকলেই অল্পাধিক চাঙগায়নী সুধা পান করলেন। কিন্তু জিনিসটির প্রভাব সকলের উপর সমান হল না। কপিল গুপ্ত গম্ভীর হয়ে বিড়বিড় করে ম্যাকবেথ আবৃত্তি করতে লাগলেন। বীরেশ্বর সিংগি এবং আরও দুজন কচি ছেলের মতন খুঁতখুঁত করে কাঁদতে লাগলেন। দু-তিন জন মেজেতে শুয়ে পড়ে নিদ্রামগ্ন হলেন। অতুল হালদার দাঁড়িয়ে উঠে হাত নেড়ে থিয়েটারী সুরে বলতে লাগলেন, শাহজাদী সম্রাটনন্দিনী, মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে? রামতারণ মুখুজ্যে বেঞ্চের উপর উবু হয়ে বসে তুড়ি দিয়ে রামপ্রসাদী গাইতে লাগলেন—

কালী, একবার খাঁড়াটা নেব;
তোমার লকলকে জিব কেটে নিয়ে মা,

ভক্তিভরে কেটে নিয়ে মা,
বাবা শিবের শ্রীচরণে দেব।

কালীবাবু তাঁর টেবিলের পিছনে বসে সমস্ত নিরীক্ষণ করছিলেন। এখন এগিয়ে এসে জটাধরকে প্রশ্ন করলেন, আজ কত টাকা হাতালে জটাধরবাবু?

জটাধর বললেন, চাঁদার কথা বলছেন? অতি সামান্য, বড়জোর পঞ্চাশ টাকা। আপনার মক্কেলরা তো কেউ টাকার আণ্ডিল নয়, সকলেরই দেখছি অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ।

—আমার দোকানে ব্যবসা করলে আমাকে কমিশন দিতে হয় তা বোঝ তো?

—বিলক্ষণ বুঝি। এই নিন পাঁচ টাকা, টেন পারসেণ্টের কিছু বেশী পোষাবে।

—তোমার ওই বদনাটায় আর কিছু আছে না কি?

—আছে বই কি, চায়ের কাপের দু কাপ হবে। খাবেন?

—দাম কিন্তু দেব না।

—আপনার কাছে আবার দাম কি। এই নিন, সবটাই খেয়ে ফেলুন।

কালীবাবু দু পেয়ালা চাঙ্গায়নী পান করলেন, একটু পরেই তাঁর চোখ ঢুলুঢুলু হল।

জটাধর বললেন, টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ে একটু বিশ্রাম করুন কালীবাবু। ভাববেন না, দশ মিনিটের মধ্যেই আপনারা সবাই চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। হাঁ, ভাল কথা—আমার টাকা একটু কম পড়েছে, কিছু হাওলাত চাই; শৃঙ্গেরী মঠে যাবার রাহাখরচ, টাকা পঁচিশ হলেই চলবে। আপনার ক্যাশ থেকে নিলুম। আপত্তি নেই তো? একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে দিই?......তাও নয়? থ্যাঙ্ক ইউ কালীবাবু,

আপনি মহাশয় ব্যক্তি, বন্ধুকে একটু সাহায্য করতে আপত্তি করবেন কেন। টাকাটা আমার নামে আপনার খাতায় ডেবিট করবেন, আবার যেদিন আসব সুদ সুদ্ধ শোধ করব।

শিবনেত্র হয়ে জড়িত কণ্ঠে কালীবাবু বললেন, আবার কবে দেখা পাব?

—সবই ঠাকুরের ইচ্ছে কালীবাবু। কানহাইয়া বাবা যখনই এখানে টানবেন তখনই এসে পড়ব। আচ্ছা, এখন আসি, দরজাটা ভেজিয়ে দিচ্ছি। একটু সজাগ থাকবেন, বড় চোরের উপদ্রব। নমস্কার।

বটেশ্বরের অবদান

বটেশ্বর সিকদার একজন প্রখ্যাত গ্রন্থকার এবং বাণীর একনিষ্ঠ সাধক, অর্থাৎ পেশাদার লেখক। যাঁদের লেখা ছাড়া অন্য কর্ম নেই তাঁদের প্রায় অর্থাভাব দেখা যায়, কিন্তু বটেশ্বর ধনী লোক। এই ব্যতিক্রমের কারণ—তিনি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক, শুধু বড় বড় উপন্যাস লেখেন, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লেখকদের মতন ছোট গল্প প্রবন্ধ কবিতা রম্যরচনা ভ্রম্যরচনা ইত্যাদি লিখে প্রতিভার অপচয় করেন না। তাঁর কোনও উপন্যাস সাত শ পৃষ্ঠার কম নয় এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের বুভুক্ষু পাঠক-পাঠিকারা তা গোগ্রাসে পড়ে ফেলেন এবং পরবর্তী রচনার জন্য ব্যগ্র হয়ে প্রতীক্ষা করেন। সম্প্রতি তাঁর পঁয়ষট্টিতম জন্মদিনের উৎসব খুব ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকালবেলা বটেশ্বর তাঁর সাধনকক্ষে বসে লিখছেন এবং মাঝে মাঝে একটি বড় টিপট থেকে চা ঢেলে খাচ্ছেন, এমন সময় একটি অচেনা যুবক ঘরে এসে ঝুঁকে নমস্কার করে বলল, আমার নাম প্রিয়ব্রত রায়, পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারবেন কি?

আগন্তুকের বয়স প্রায় ত্রিশ, সুশ্রী চেহারা, সজ্জায় দারিদ্র্যের লক্ষণ নেই, পারিপাট্যও নেই। বটেশ্বর একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, ব'স। নতুন পত্রিকা বার করছ, তার জন্যে আমার লেখা চাও, এই তো? আগেই বলে দিচ্ছি, আমি কল্পতরু নই, যে চাইবে তাকেই লেখা দিতে পারি না। একটা আশীর্বাণী যদি চাও তো দিতে পারি, দশ টাকা লাগবে।

প্রিয়ব্রত বলল, আজ্ঞে, লেখার জন্যে আপনাকে বিরক্ত করতে আসি নি, শুধু একটি কথা জানতে এসেছি। 'প্রগামিণী' পত্রিকায় 'কে থাকে কে যায়' নামে আপনার যে গল্পটি বার হচ্ছে তা শেষ হতে আর ক মাস লাগবে দয়া করে বলবেন কি?

—আরও ছ-সাত মাস লাগবে। কেন বল তো? কেমন লাগছে লেখাটা?

—অতি চমৎকার, সব চরিত্র যেন জীবন্ত। বড্ড কৌতূহল হচ্ছে তাই জানতে এসেছি—গল্পের নায়িকা ওই অলকা মেয়েটি যে টি-বি স্যানিটোরিয়মে আছে, সে সেরে উঠবে তো?

প্রিয়ব্রতর আগ্রহ দেখে বটেশ্বর খুশী হলেন। একটু হেসে বললেন, তা তোমাকে বলব কেন? প্লট আগেই ফাঁস করে দিলে রচনার রসভঙ্গ হয়।

হাত জোড় করে প্রিয়ব্রত বলল, সার, দয়া করে অলকাকে বাঁচিয়ে দেবেন।

—তোমার তো বড় অদ্ভুত আবদার হে! গল্পের নায়িকার জন্যে এত ভাবনা কেন? লোকে মিলনান্ত বিয়োগান্ত দু রকম গল্পই চায়, তোমার ফরমাশ মতন আমি লিখতে পারি না। মিলনান্ত চাও তো আমার 'কাড়াকাড়ি', 'তেটানা' এই সব পড়তে পার।

প্রিয়ব্রত করুণ স্বরে বলল, দয়া করুন সার।

—তুমি একটি আস্ত পাগল। এখন যাও, আমার ঢের কাজ। অলকার জন্যে মাথা খারাপ না করে নিজের চিকিৎসা করাও গে, নিশ্চয় তোমার মনের রোগ আছে।

প্রিয়ব্রত বিষণ্নমুখে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে গেল।

রাত সাড়ে নটার সময় বটেশ্বর খেতে যাচ্ছেন এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার ধরে বললেন, কাকে চান?... হাঁ, আমিই বটেশ্বর। আপনি কে?

উত্তর এল—নমস্কার। আমি ডাক্তার সঞ্জীব চাটুজ্যে, আপনার কাছে একটু বিশেষ দরকার আছে। কাল সকালে আটটার সময় যদি যাই আপনার অসুবিধা হবে না তো?

বটেশ্বর বললেন, না না, আপনি আসতে পারেন। কি দরকার বলুন তো?

—সাক্ষাতেই সব বলব সার। আচ্ছা, নমস্কার।

ডাক্তার সঞ্জীব চাটুজ্যের নাম বটেশ্বর শুনেছেন। বছর দুই হল বিলাত থেকে ফিরেছেন, বয়স বেশী নয়, খুব নাকি ভাল সার্জন, বেশ পসার হয়েছে।

পরদিন সকালে সঞ্জীব ডাক্তার এসে বললেন, গুড মর্নিং সার, আপনার মহামূল্য সময় আমি নষ্ট করব না, দশ মিনিটের মধ্যেই বক্তব্য শেষ করব। ওঃ কি আশ্চর্য আপনার ক্ষমতা! 'প্রগামিণী' পত্রিকায় 'কে থাকে কে যায়' নামে যে গল্পটি লিখছেন তার তুলনা নেই, দেশ সুদ্ধ লোক মুগ্ধ হয়ে গেছে। শরৎ চাটুজ্যে তারাশংকর বনফুল প্রবোধ সান্ডেল সবাইকে কাত করে দিয়েছেন মশাই।

বটেশ্বর সহাস্যে বললেন, আপনার তো খুব প্র্যাকটিস শুনতে পাই, আমার লেখা পড়বার সময় পান কি করে?

—সময় করে নিতে হয় সার, না পড়লে যে চলে না। সর্বত্র এই গল্পটির কথা শুনি, আমাদের মেডিক্যাল ক্লাবে পর্যন্ত। সেদিন একটি বৃদ্ধ লোকের হার্নিয়া অপারেশন করছি, অ্যানিসথেটিকের ঝোঁকে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—কি খাসা মেয়ে অলকা, জিতা রহো অলকা! আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুর দল তো আপনার অলকার জন্যে খেপে

উঠেছে। ধন্য আপনি! সকলেই বলে, এখনকার সাহিত্যসম্রাট হচ্ছেন শ্রীবটেশ্বর সিকদার, তাঁর কাছে দামোদর নশকর গল্পসরস্বতী দাঁড়াতেই পারেন না। এখন আমার নিবেদনটি জানাই। আমার বন্ধু-বর্গের তরফ থেকে অনুরোধ করতে এসেছি—অলকা মেয়েটিকে চটপট সারিয়ে দিন, সবাই তার জন্য চিন্তিত হয়ে উঠেছে। স্যানিটোরিয়ম থেকে বেশ সুস্থ করে ফিরিয়ে আনুন। একবারে থরো কিওর চাই, বুঝলেন? তার স্বামী হেমন্তর অবস্থা তো বেশ ভালই, অলকাকে নিয়ে সে সিমলা কি উটকামন্ড চলে যাক, সেখানে তিনটি মাস কাটিয়ে বেশ মোটাসোটা করে ঘরে নিয়ে আসুক।

বটেশ্বর কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, তা তো হবার জো নেই ডাক্তার চ্যাটার্জি, আমার এই রচনাটি যে ট্রাজেডি। অলকা বাঁচবে না।

—বলেন কি মশাই, আলবত বাঁচবে। আধুনিক চিকিৎসায় টি-বি রোগী শতকরা নব্বুইজন সেরে ওঠে। অলকার ভাল ট্রিটমেণ্ট করান, পি-এ-এস, আইসোনায়াজাইড, স্ট্রেপ্টোমাইসিন এই সব ওষুধ দিন। বলেন তো আমার বন্ধু ডাক্তার বড়ালের সঙ্গে একটা কনসলটেশনের ব্যবস্থা করি।

বটেশ্বর বিব্রত হয়ে পড়লেন। কাল এক পাগল এসেছিল, আজ আর এক বড় পাগলের কবলে তিনি পড়েছেন। কিন্তু এই সজীব ডাক্তার গুণগ্রাহী লোক, এঁকে ধমক দিয়ে হাঁকিয়ে দেওয়া চলে না। এঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আর নিরর্থক উপদেশ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বটেশ্বর মনে করলেন, গল্পের পরিণামটা জানিয়ে দেওয়াই ভাল। বললেন, আপনি ভুলে যাচ্ছেন ডাক্তার চ্যাটার্জি, অলকা সত্যিকারের মানুষ নয়, আমার উপন্যাসের নায়িকা। তাকে বাঁচালে আমার প্লটটি মাটি হবে। অলকা মরবে, তার দু বছর পরে তার স্বামী হেমন্তর

সঙ্গে শর্বরীর বিয়ে হবে, ওই যে মেয়েটি পাঁচটি বৎসর হেমন্তর জন্য প্রতীক্ষা করেছে।

টেবিলে কিল মেরে সঞ্জীব ডাক্তার বললেন, অ্যাবসর্ড, তা হতেই পারে না। অলকার স্বামী হল তার হকের ধন, অন্য মেয়ে তাকে কেড়ে নেবে কেন?

—শর্বরীর কথাটাও ভেবে দেখুন ডাক্তার চ্যাটার্জি। রূপে গুণে বিদ্যায় স্বাস্থ্যে সে অলকার চাইতে ভাল। এত বৎসর প্রতীক্ষার পর হেমন্তকে না পেলে তার বুক যে ফেটে যাবে!

—ফাটলেই হল! বুক অত সহজে ফাটে না মশাই, খুব শক্ত টিশুতে তৈরী। হার্ট খারাপ হয় তো চিকিৎসা করাবেন, ডিজিটালিস অ্যামিনোফাইলিন থেলিন এই সব দেবেন। বুকে বোরিক কমপ্রেস, তিসির পুলটিস আর আইসব্যাগ লাগাবেন। শর্বরীর বিয়ে নাই বা দিলেন, তাকে রাজকুমারী অমৃত কাউরের কাছে পাঠিয়ে দিন, তিনি তাকে নর্সিং শেখাবার ব্যবস্থা করবেন।

—আপনি আমার লেখা পড়ে উত্তেজিত হয়েছেন, কাল্পনিক পাত্র-পাত্রীদের জীবন্ত মনে করেছেন, এ আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়। কিন্তু একটু স্থির হয়ে লেখকের দিকটাও বিবেচনা করুন। মিলনান্ত বিয়োগান্ত দু রকম গল্পই আমাদের লিখতে হয়। ভগবান সুখ দেন, দুঃখ দেন, মানুষকে রক্ষা করেন, আবার মারেনও। তিনি মিলন-বিরহ দিয়ে সংসার সৃষ্টি করেছেন। আমরা লেখকরা ভগবানেরই অনুসরণ করি। লোকে নিজে শোক পেতে চায় না, কিন্তু ট্রাজেডি বেশ উপভোগ করে। সেই জন্যেই তো মহাকবিরা সীতা, অজমহিষী ইন্দুমতী, ওফেলিয়া, ডেসডিমোনা ইত্যাদির সৃষ্টি করেছেন। ভগবান সব সময় দয়া করেন না, আমরাও করি না।

—কি বলছেন মশাই, ভগবানের নকল করবেন এতদূর আস্পর্ধা!

ভগবান নাচার, সব সময় দয়া করলে তাঁর চলে না, তা বোঝেন? ইঁদুরকে যদি দয়া করেন তো বেড়াল উপোস করবে। মাছ মুরগি পাঁঠা ভেড়াকে দয়া করলে আপনার আমার পেটই ভরবে না। তিনি যখন মানুষকে দয়া করেন তখন মাইক্রোব ধ্বংস হয়, আবার মাইক্রোবকে দয়া করলে মানুষ মরে। নিজের হাত-পা বাঁধা বলেই ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন, বলেছেন—আমার হয়ে তোরাই যতটা পারিস দয়া করবি, মনে রাখিস অহিংসাই পরম ধর্ম। গল্প লিখছেন বলেই আপনি মানুষ খুন করবেন এ কি রকম কথা! সেকালে বাল্মীকি কালিদাস শেকস্পীয়ার কি লিখেছিলেন তা ভুলে যান। এটা হল গান্ধীজীর যুগ, বিয়োগান্ত রচনা একদম চলবে না। যারা ট্রাজেডি লেখে আর তা পড়তে ভালবাসে তারা মরবিড, প্রচ্ছন্ন নিষ্ঠুর। মানুষের তো দুঃখের অভাব নেই, তার ওপর আবার মনগড়া-দুঃখের কাহিনী চাপাবেন কেন? আনন্দের গল্প লিখুন, মানুষকে আর কাঁদাবেন না, শুধু হাসাবেন। আপনাদের ভাবনা কি, কলমের আঁচড়েই তো সৃষ্টি স্থিতি লয় করতে পারেন। অলকাকে বাঁচাতেই হবে, বুঝলেন সিকদার মশাই? শারলক হোম্‌সকে কোনান ডয়েল মেরে ফেলেছিলেন, কিন্তু পাঠকদের ধমক খেয়ে আবার বাঁচিয়ে দিলেন। আপনিই বা বাঁচাবেন না কেন?

উত্যক্ত হয়ে বটেশ্বর বললেন, মাপ করবেন ডাক্তার চ্যাটার্জি, আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না। আমরা লে-ম্যান লেখকরা তো আপনাদের চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করি না, আপনারাই বা লেখকদের হুকুম করবেন কেন? অনধিকারচর্চা কোনও পক্ষেই ভাল নয়।

সঞ্জীব ডাক্তার দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আমি অনধিকারচর্চা করি না, ডাক্তারের কাজ প্রাণরক্ষা, আপনি খুন করতে যাচ্ছেন তাতে আপত্তি জানানো আমার কর্তব্য। বেশ, যা খুশি করুন, আপনার পরম ভক্ত

ন লাখ পাঠক আর চার লাখ পাঠিকা চটে গিয়ে আপনাকে শাপ দেবে, আপনার এই কুকর্মের ফল পরলোকে ভুগতে হবে। একটু সাবধানে থাকবেন মশাই, এখনকার ছোকরারা ভাল নয়। আচ্ছা, চললুম। যদি হাড়টাড় ভাঙে তো খবর দেবেন। নমস্কার।

সঞ্জীব ডাক্তার বটেশ্বরের মন খারাপ করে দিয়ে চলে গেলেন। গতকাল সকালে যে ছোকরা এসেছিল—প্রিয়ব্রত রায়—সে পাগল হলেও শান্তশিষ্ট। কিন্তু এই সঞ্জীব ডাক্তার দুর্দান্ত উন্মাদ। শুধু উন্মাদ নয়, মনে হয় ফাজিল বকাটে আর মাতালও বটে। এমন লোকের চিকিৎসায় পসার হল কি করে? যাই হ'ক, পাগলদের কথায় বটেশ্বর কর্ণপাত করবেন না, তাঁর সংকল্পিত প্লট কিছুতেই বদলাবেন না। কিন্তু সঞ্জীব ডাক্তার ভয় দেখিয়ে গেছে, সাবধানে থাকতে হবে।

তিন দিন পরের কথা। বিকালবেলা দোতলার বারান্দায় বসে বটেশ্বর চুরুট টানছেন। তাঁর বাতের বেদনাটা বেড়ে উঠেছে, সিঁড়ি দিয়ে নামাওঠায় কষ্ট হয়। ছেলেমেয়েদের নিয়ে গৃহিণী কাশীপুরে তাঁর ছোট বোনের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। বটেশ্বরের কোথাও যাবার জো নেই, কথা কইবার লোকও নেই। তাঁর অনুরক্ত বন্ধুদের কেউ যদি এখন এসে পড়েন তো তিনি খুশী হন।

চাকর এসে খবর দিল, একজন মহিলা দেখা করতে এসেছেন। বটেশ্বর বললেন, এখানে নিয়ে আয়।

একটি সুবেশা চব্বিশ-পঁচিশ বছরের মেয়ে তাঁর কাছে এল, একটু মোটা হলেও বেশ সুন্দরী বটে। সে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পায়ে হাত দিলে। বটেশ্বর বললেন, থাক থাক, ওই হয়েছে। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—চিনতে পারছেন না? আমি কদম্বানিলা চ্যাটার্জি, সিনেমার ছবিতে আমাকে দেখেন নি? মধ্যগগনের তারকা না হলেও আমাকে সবাই উদীয়মানা মনে করে।

—বেশ বেশ। সিনেমা বড় একটা দেখি না, খবরও বিশেষ রাখি না। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন ওই চেয়ারটায়।

—আমাকে 'আপনি' বলবেন না সার।

কদম্বানিলা পান চিবুতে চিবুতে কথা বলছিল, সেই বেআদবি দেখে বটেশ্বর একটু অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েটির নম্র ব্যবহারে তাঁর বিরাগ কেটে গেল, ভাবলেন, আমার সামনে সিগারেট ফুঁকছে না এই ঢের। প্রশ্ন করলেন, কদম্বানিলা তো ছদ্মনাম, তোমার আসল নামটি কি?

—তা যে বলতে নেই সার। সন্ন্যাসী আর সিনেমা-তারার পূর্বনাম জানানো বারণ, গুরুর নিষেধ থাকে কি না। কদম্বানিলা বলতে যদি অসুবিধে হয় তো আপনি কদু বলবেন।

—উঁহু, কদু চলবে না, পুরো নামটাই বলব। এখন কি দরকারে এসেছ তা বল।

মাথা পিছনে হেলিয়ে চোখ আধবোজা করে গদ্‌গদস্বরে কদম্বানিলা বলল, উঃ কি আশ্চর্য গল্প আপনি লিখেছেন দাদু, ওই 'প্রগামিণী' পত্রিকায় যেটি ক্রমশ বেরুচ্ছে! সবাই ধন্য ধন্য করছে, বলছে এত বড় সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত আর হয় নি। আমি একটি প্রস্তাব এনেছি, বিজনেস প্রোপোজাল। এই গল্পটির ছবি অতি চমৎকার হবে। লালা নেবুচাঁদ নাজার দশ ল্যখ পর্যন্ত খরচ করতে প্রস্তুত আছেন। আপনার নায়িকা অলকার পার্ট আমিই নেব। দেবকী বোস কি অন্য কোনও উপযুক্ত লোককে ডিরেকশনের ভার

দেওয়া হবে। তা হাজার দশ টাকা কি আরও বেশী লালাজী আপনাকে দেবেন, আমাকেও মন্দ দেবেন না। এখন আপনি রাজী হলেই হয়।

খুশী হয়ে বটেশ্বর বললেন, তা আমার আর আপত্তি কি, তুমি নায়িকা সাজলে খুব ভালই হবে। কিন্তু গল্পটি শেষ হতে এখনও তো ছ-সাত মাস লাগবে।

—তার জন্যে ভাববেন না দাদু। আমারও এখন অনেক এনগেজ-মেণ্ট, সাত মাস আমি বোম্বাইএ ব্যস্ত থাকব, নেবুচাঁদজীও থাকবেন। তিনি এখন শুধু আপনার মতটি জানতে চান, পাকা কথাবার্তা সাত মাস পরেই হবে। কিন্তু এর মধ্যে আপনি আর কাউকে কথা দিয়ে ফেলবেন না যেন।

—না, না, তা কেন দেব।

—আপনি দেখে নেবেন, আমার অভিনয় কি ওআণ্ডারফুল হবে, আপনার ওই অলকাকে আমার খুব ভাল লেগেছে কিনা। উঃ, ছবির শেষে অলকা যখন বেশ মোটাসোটা হয়ে তার তিন মাসের খোকাটিকে কোলে নিয়ে পর্দায় দেখা দেবে তখন হাততালিতে হাউস একেবারে ফেটে পড়বে, আর আপনি উপস্থিত থাকলে লোকে আপনাকে কাঁধে তুলে নাচবে।

বটেশ্বর ত্রস্ত হয়ে বললেন, এই মাটি করলে, সব শেয়ালের এক রা! আমাকে পাগল না করে তোমরা ছাড়বে না দেখছি। শোন কদম্বানিলা, আমার গল্পটি বিয়োগান্ত, অলকা মরবে, দু বছর পরে তার স্বামী হেমন্তর সঙ্গে শর্বরীর বিয়ে হবে।

চমকে উঠে চোখ কপালে তুলে কদম্বানিলা বলল, অ্যাঁ, অলকাকে মারবেন! তবে আমি ওতে নেই, ও আমি পারব না।

—নিশ্চয় পারবে, ট্রাজেডির নায়িকা সেজেও তো চমৎকার অভিনয় করা যায়।

—তা হতেই পারে না, মরতে আমি মোটেই রাজী নই, অলকা সেজেও নয়। আপনি সব মাটি করে দিলেন দাদু, মিছেই এখানে এসে আপনাকে বিরক্ত করলুম। তা হলে চললুম, গল্পসরস্বতী দামোদর নশকরের সঙ্গেই কথা বলি গিয়ে। তাঁর 'মানস-মরালী' উপন্যাসটি অপূর্ব হয়েছে, তার নায়িকা মঞ্জুলার পার্টটিও আমার বেশ পছন্দ।

বটেশ্বর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দিন কতক আগে 'দুন্দুভি' পত্রিকায় একটা গণ্ডমূর্খ সমালোচক লিখেছিল—দামোদর নশকরের গল্প যুগ-চেতনা সমাজচেতনা যৌনচেতনায় পরিপূর্ণ, বটেশ্বর সিকদারের রচনা একেবারে অচেতন, শুধু চর্বিতচর্বণ। এই সমালোচনা পড়ার পর থেকে দামোদরের নাম শুনলে বটেশ্বর খেপে ওঠেন। উত্তেজিত হয়ে হাত নেড়ে বললেন, খবরদার ওটার কাছে যেয়ো না। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, দু দিন সময় আমাকে দাও, ভেবে দেখি অলকাকে বাঁচিয়ে গল্পটি মিলনান্ত করা চলে কিনা।

—ভাবনার যে সময় নেই দাদু। কালই আমি বোম্বাই চলে যাচ্ছি, আজকের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত করে নেবুচাঁদজীকে জানাতে হবে।

গালে হাত দিয়ে একটু ভেবে বটেশ্বর বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, অলকাকে বাঁচিয়েই রাখব, শর্বরীই না হয় মরবে। অন্য কারও কাছে তোমাকে যেতে হবে না। জান কদম্বানিলা, আমরা গল্পলিখিয়েরা হচ্ছি সর্বশক্তিমান, কলমের খোঁচায় সৃষ্টি স্থিতি লয় করতে পারি।

কদম্বানিলা উৎফুল্ল হয়ে বলল, থ্যাংক ইউ দাদু, এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতন কথা। দিন পায়ের ধুলো। গল্পটি কিন্তু বেশ ভাল করে শেষ করতে হবে, শেষ দৃশ্যে ছেলে কোলে করে অলকার আসা চাই। এখন চললুম, নেবুচাঁদজীকে সুখবরটা দিইগে।

বটেশ্বর সিকদার প্রতিশ্রুতি পালন করলেন, তাঁর গল্প 'কে থাকে কে যায়' মিলনান্তরূপেই সমাপ্ত হল। কিন্তু আট মাস হতে চলল, কদম্বানিলার দেখা নেই কেন? তার ঠিকানাটাও জানেন না যে চিঠি লিখে খবর দেবেন।

সকাল বেলা বটেশ্বর তাঁর নীচের ঘরে বসে নিবিষ্ট হয়ে একটি নূতন গল্প লিখছেন—'মন নিয়ে ছিনিমিনি।' সহসা একটা চেনা গলার আওয়াজ তাঁর কানে এল—আসতে পারি সিকদার মশাই?

ডাক্তার সঞ্জীব চাটুজ্যে ঘরে প্রবেশ করলেন, তাঁর পিছনে প্রিয়ব্রত রায় এবং একটি অচেনা মেয়ে। সঞ্জীব ডাক্তার বললেন, গুড মর্নিং সার। ওঃ আপনার সেই গল্পটিকে একেবারে মহত্তম অবদান বানিয়েছেন মশাই! একে নিশ্চয় চিনতে পেরেছেন—প্রিয়ব্রত রায়, যাকে আপনি পাগল বলে হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। আর এই দেখুন আপনার অলকা, আপনি যার প্রাণরক্ষা করেছেন।

বটেশ্বরকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে অলকা একটি পাতলা কাগজে মোড়া বড় কৌটো রাখল। সঞ্জীব ডাক্তার বললেন, আপনার জন্যে অলকা নিজের হাতে ছানার মালপো করে এনেছে, খাবেন সার।

হতভম্ব হয়ে বটেশ্বর বললেন, কিছুই তো বুঝতে পারছি না!

—এটা হল আপনার গল্পের সত্যিকার উপসংহার। বুঝিয়ে দিচ্ছি শুনুন।—এই অলকা হচ্ছে প্রিয়ব্রতর স্ত্রী, আমার শালী—মানে আমার স্ত্রীর মাসতুতো বোন। অলকা বছর খানিক স্যানিটোরিয়মে ছিল, বেশ সেরেও উঠেছিল, কুক্ষণে এর হাতে এল প্রগামিণী পত্রিকা। আপনার গল্প পড়তে পড়তে এর মাথায় এক বেয়াড়া ধারণা এল—গল্পের অলকা যদি বাঁচে তবেই আমি বাঁচব, সে যদি মরে তবে আমিও মরব। আমরা অনেক বোঝালুম, ওসব রাবিশ গল্প পড়ে মাথা খারাপ ক'রো না, তুমি তো সেরেই উঠছ। কিন্তু অলকার বদখেয়াল কিছুতেই

দূর হল না, রেগুলার অবসেশন। অগত্যা ওর স্বামী এই প্রিয়ব্রত আপনার দ্বারস্থ হল, আপনি ওকে পাগল বলে হাঁকিয়ে দিলেন। তার পর আমি এসে আপনাকে একটি সারগর্ভ লেকচার দিলুম, আপনি তো চটেই উঠলেন। তখন আমার স্ত্রী বলল, তোমাদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না, যত সব অকম্মার ধাড়ী, আমিই যাচ্ছি, দেখি বুড়োকে বাগ মানাতে পারি কিনা। সে আপনার সঙ্গে দেখা করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজ হাসিল করল। আপনি গল্পের প্লট বদলালেন, অলকাও চটপট সেরে উঠল। এখন কি রকম মুটিয়েছে দেখুন।

বটেশ্বর বললেন, কিন্তু আমার কাছে যিনি এসেছিলেন তিনি তো সিনেমা-অভিনেত্রী, কদম্বানিলা চ্যাটার্জি।

—ওর চোদ্দপুরুষ কখনও সিনেমায় নামে নি। ও হল আমার স্ত্রী অনিলা, নাম ভাঁড়িয়ে কদম্বানিলা সেজে আপনাকে ঠকিয়ে গেছে। অতি ধড়িবাজ মহিলা মশাই। যাক, এখন আপনি এই আসল অলকাকে ভাল করে আশীর্বাদ করুন দেখি।

—হাঁ হাঁ, নিশ্চয় করব। মা অলকা, চিরায়ুষ্মতী হও, সুখে থাক, স্বামীর সোহাগিনী হও, সুসন্তানের জননী হও, লক্ষ্মী তোমার ঘরে অচলা হয়ে থাকুন। আচ্ছা ডাক্তার, সব তো বুঝলুম, কিন্তু আপনার স্ত্রী অনিলা না কদম্বানিলা এলেন না কেন?

—আসবে কি করে মশাই! সে আছে মেটার্নিটি হোমে, তার একটা খোকা হয়েছে, পাক্কা দশ পাউন্ড ওজন। অনিলা চাঙ্গা হয়ে উঠুক, তার পর আপনার কাছে এসে ধাপ্পাবাজির জন্যে মাপ চাইবে।

১৮৭৮

নির্মোক নৃত্য

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, তোমার মতলবটা কি উর্বশী? এই স্বর্গধামে তো পরম সুখে আছ, উত্তম বাসগৃহ, সুন্দর প্রমোদকানন, মহার্ঘ বেশভূষা, প্রচুর বেতন, সবই তো ভোগ করছ। এসব ত্যাগ করে মর্ত্যলোকে যেতে চাও কেন? এখন রাজা পুরূরবা সেখানে নেই যে তোমাকে মাথায় করে রাখবেন। স্বর্গে তুমি চির-যৌবনা অনিন্দিতা সুরেন্দ্রবন্দিতা, কিন্তু মর্ত্যে গেলেই দু দিনে বুড়িয়ে যাবে, তখন যতই প্রসাধন লেপন কর তোমার দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না।

উর্বশী নতমস্তকে বললেন, দেবরাজ, এখানে আমার অরুচি ধরেছে। সব পুরুষকেই আমি জয় করেছি, তাদের একঘেয়ে চাটুবাক্য আমার আর ভাল লাগে না। পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে আমার অসংখ্য ভক্ত জুটবে, অর্থও প্রচুর পাব। জরার লক্ষণ দেখলে আবার না হয় এখানে চলে আসব।

—তোমার অত্যন্ত অহংকার হয়েছে দেখছি। এখানে তোমার আদরের অভাবটা কি?

—মানুষের কাছে ঢের বেশী আদর পাব। মর্ত্যের এক কবি লিখেছেন, 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল, তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল।' অমরাবতীর কোন্ কবি এমন লিখতে পারে?

—কবিরা বিস্তর মিছে কথা লেখে। যদি প্রমাণ করতে পার যে

এখানকার সব পুরুষকে তুমি জয় করেছ তবে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি। দেবর্ষি আর মহর্ষিদের কাবু করতে পার?

—তাঁরা তো সেই কবে কাবু হয়ে গেছেন।

—আচ্ছা, তোমাকে পরীক্ষা করব। দিব্য মানব জান? যাঁরা স্বর্গে মর্ত্যে অবাধে আনাগোনা করেন, যেমন সনৎকুমার সনাতন সনক সদানন্দ। এঁরা হলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র। এঁদের ঘাঁটাতে চাই না, অত্যন্ত বদরাগী মুনি। তবে আরও তিন জন সম্প্রতি এখানে বেড়াতে এসেছেন, কুতুক, পর্বত, আর কর্দম ঋষি। এঁরা বেশ শান্তস্বভাব আর একবারে নির্বিকার। এঁদের কাবু করতে পারবে?

—যদি পুরুষ হন তবে কাবু করতে পারব না কেন?

—শুধু পুরুষ নন, ওঁরা মহাপুরুষ।

—তবে ওঁদের মহাকাবু করব।

—উত্তম কথা। ওঁরা হলেন দেবর্ষি নারদের বন্ধু। নারদকে বলব তোমার নাচ দেখবার জন্যে আমার সভায় ওঁদের নিমন্ত্রণ করে আনবেন।

নারদের মুখে নিমন্ত্রণ পেয়ে তিন ঋষি প্রীত হলেন। বললেন, আমরা ময়ূরনৃত্য খঞ্জননৃত্য দেখেছি, বানর-ভল্লুকাদির নৃত্যও দেখেছি, কিন্তু নারীনৃত্য কখনও দেখি নি। দেখবার জন্য খুব কৌতূহল আছে। কিন্তু উর্বশী তো শুনেছি অপ্সরা, সে নারী বটে তো?

নারদ বললেন, এমন নারী যার জন্যে 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষো-মাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা।' তার নৃত্য দেখলে তোমরা মুগ্ধ হবে। এখন ইন্দ্রসভায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নাও।

পর্বত ঋষির দাড়ি গলা পর্যন্ত, কর্দমের বুক পর্যন্ত, আর কুতুক

ঋষির হাঁটু পর্যন্ত। এঁরা যথাসাধ্য ভব্যবেশ ধারণ করে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলেন। পর্বত একটি বল্কল পরলেন, বল্কল না থাকায় কর্দম শুধু কৌপীন ধারণ করলেন। মহামুনি কুতুক একবারে সর্বত্যাগী নিষ্কিঞ্চন, তাঁর বল্কলও নেই কৌপীনও নেই, অগত্যা তিনি দিগম্বর হয়েই রইলেন। নারদ বললেন, ওহে কুতুক, অন্তত একটি তৃণগুচ্ছের মেখলা পরে নাও। কুতুক বললেন, কোনও প্রয়োজন নেই, আজানু-লম্বিত শ্মশ্রুই আমার বসন।

নবাগত তিন ঋষিকে পাদ্য অর্ঘ্য আসন ইত্যাদি দিয়ে যথাবিধি সৎকার করে ইন্দ্র বললেন, হে মহাতেজা তপঃসিদ্ধ জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিত্রয়, আমার মুখ্যা অপ্সরা উর্বশী আপনাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত একটি অভিনব নৃত্য দেখাবে—নির্মোক নৃত্য, মর্ত্যলোকের প্রতীচ্য-খণ্ডের ম্লেচ্ছগণ যাকে বলে স্ট্রিপ-টীজ। এখানে অগ্নি বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণ, অগস্ত্যাদি মহর্ষিগণ সকলেই সমবেত হয়েছেন, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাও আছেন। আপনাদের আগমনে আমরা সকলেই কৃতার্থ হয়েছি। এখন অনুমতি দিন, উর্বশী নৃত্য আরম্ভ করুক।

আগন্তুক তিন ঋষির মুখপাত্র মহামুনি কুতুক বললেন, হাঁ হাঁ, বিলম্বে প্রয়োজন কি, আমরা নৃত্য দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

লাস্যনৃত্যের উপযুক্ত বেশভূষার উপর একটি আলখাল্লা বা ঘেরা-টোপ পরে উর্বশী ইন্দ্রসভায় প্রবেশ করলেন। সকলকে প্রণাম করে যুক্তকরে বললেন, হে মহাভাগ দেবগণ এবং অগ্নিকল্প ঋষিগণ, আমি যে নির্মোক নৃত্য দেখাব তাতে আমার দেহ ক্রমে ক্রমে অপাবৃত হবে। আপনাদের তাতে আপত্তি নেই তো?

কুতুক তাঁর মাথা আর বিপুল দাড়ি নেড়ে বললেন, আপত্তি

কিসের? যাবতীয় জন্তুর ন্যায় তোমার দেহও পঞ্চভূতের সমষ্টি। তার অভ্যন্তরে নারীসত্তা কোথায় আছে তাই আমরা দেখতে চাই।

উর্বশী পুনর্বার সবিনয়ে বললেন, আমার নৃত্যে যদি অসভ্য বা কুৎসিত কিছু দেখতে পান তো দয়া করে জানাবেন, তৎক্ষণাৎ আমি নৃত্য সংবরণ করব।

ঘেরাটোপ ফেলে দিয়ে উর্বশী তাঁর মণিমুক্তাস্বর্ণময় দৃষ্টি-বিভ্রমকর উজ্জ্বল বেশ প্রকাশ করলেন। তার পর কিছুক্ষণ নৃত্য করে তাঁর উত্তরীয় বা ওড়না খুলে ফেলে দিলেন।

পর্বত ঋষি হাত তুলে বললেন, উর্বশী, নিবৃত্ত হও, তোমার নৃত্যে শালীনতার অত্যন্ত অভাব দেখছি। এই চিত্তপীড়াকর নৃত্য আমরা দেখতে চাই না।

মহামুনি কুতুক ধমক দিয়ে বললেন, তোমার চিত্তপীড়া হয়েছে তো আমাদের কি? তুমি চক্ষু মুদ্রিত করে থাক, নৃত্য চলুক।

উর্বশী চুপি চুপি ইন্দ্রকে বললেন, দেবরাজ, পর্বত ঋষি কাবু হয়েছেন।

নৃত্য চলতে লাগল। পর্বত ঋষি দুই হাতে চোখ ঢাকলেন, কিন্তু কৌতূহল দমন করতে না পেরে আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলেন।

ক্রমে ক্রমে উর্বশী তাঁর দেহের ঊর্ধ্বাংশ অনাবৃত করলেন। তখন কর্দম ঋষি চোখ ঢেকে বললেন, উর্বশী, তোমার এই জুগুপ্সিত নৃত্য দেখলে আমাদের তপস্যা নষ্ট হবে। ক্ষান্ত হও।

কুতুক ভর্ৎসনা করে বললেন, কেন ক্ষান্ত হবে? তোমার সহ্য না হয় তো উঠে যাও এখান থেকে।

সহাস চক্ষুর ইঙ্গিতে উর্বশী ইন্দ্রকে জানালেন যে কর্দমও কাবু হয়েছেন।

তার পর উর্বশী ক্রমশ তাঁর সমস্ত আবরণ আর আভরণ খুলে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন এবং অবশেষে 'কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি' প্রকাশ করে পাষাণবিগ্রহবৎ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সভাস্থ দেবগণ দেবর্ষিগণ ও মহর্ষিগণ বললেন, সাধু সাধু!

কুতুক বললেন, থামলে কেন উর্বশী, আরও নির্মোক ত্যাগ কর।

নারদ বললেন, আর নির্মোক কোথায়? উর্বশী তো সমস্তই মোচন করেছে।

কুতুক বললেন, ওই যে, ওর সর্বগাত্রে একটি পদ্মপলাশতুল্য শুভ্রারক্ত মসৃণ আবরণ রয়েছে।

—আরে ও তো ওর গায়ের চামড়া।

—ওটাও খুলে ফেলুক।

—পাগল হলেন নাকি হে কুতুক? গায়ের চামড়া তো শরীরেরই অংশ, ও তো পরিচ্ছদ নয়।

—পরিচ্ছদ না হ'ক নির্মোক তো বটে। ওই খোলসটাও খুলে ফেলুক, নীচে কি আছে দেখব।

নারদ বললেন, কি আছে শোন। চর্মের নীচে আছে মেদ, তার নীচে মাংস, তার নীচে কংকাল।

—তার নীচে কি আছে?

—কিচ্ছু নেই।

—যার প্রভাবে 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা', উর্বশীর সেই নারীত্ব কোথায় আছে?

—নারীত্ব আছে ওর বসনে, আভরণে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, ভাবভঙ্গীতে,

আর অনুরাগী পুরুষের চিত্তে। তুমি তো বীতরাগ, চিত্ত পুড়িয়ে খেয়েছ, দেখবে কি করে?

মহামুনি কুতুক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমাকে প্রতারিত করবার জন্যে এখানে ডেকে এনেছ? এই উর্বশী একটা অন্তঃসারশূন্য জন্তু, ছাগদেহের সঙ্গে ওর দেহের প্রভেদ কি? ওহে পর্বত, ওহে কর্দম, চল আমরা যাই, এখানে দেখবার কিছু নেই।

উর্বশীর লাঞ্ছনা দেখে মেনকা ঘৃতাচী মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরার দল আনন্দে করতালি দিলেন।

কুতুক পর্বত ও কর্দম সভা ত্যাগ করলে উর্বশী নতমুখে অশ্রু-পাত করতে লাগলেন।

ইন্দ্র বললেন, উর্বশী, শান্ত হও, নিরন্তর জয়লাভ কারও ভাগ্যে ঘটে না, আমিও বৃত্রাসুর কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলাম।

উর্বশী বললেন, একে কি পরাজয় বলে দেবরাজ? ওই কুতুক ঋষি একটা অপুরুষ অপদার্থ দগ্ধেন্দ্রিয় উন্মাদ, ওকে দিয়ে এই সভায় আমার এমন অপমান করিয়ে আপনার কি লাভ হল? আমি অমরা-বতীতে থাকব না, মর্ত্যেও যাব না, তপশ্চর্যা করব।

অনন্তর উর্বশী মাথা মুড়োলেন, তুলসীমালা পরলেন, তিলকচর্চা করলেন, এবং নিত্যধাম গোলোকে গিয়ে হরিপাদপদ্মে আশ্রয় নিলেন।

১৮৭৮

ডম্বরু পণ্ডিত

আচার্য রোহিত তাঁর শিষ্য ডম্বরুকে বললেন, বৎস, তুমি নিখিল বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছ, স্নাতক হবার পরেও এখানে দশ বৎসর স্নাতকোত্তর গবেষণা করেছ, তোমার যৌবনও উত্তীর্ণপ্রায়। আর আমার কাছে বৃথা কালক্ষেপ করে লাভ কি? এখন তুমি এই ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গার্হস্থ্যে প্রবেশ কর।

ডম্বরু প্রণিপাত করে রোহিতের চরণে একটি ক্ষুদ্র সুবর্ণখণ্ড রেখে বললেন, গুরুদেব, আমি অতি দরিদ্র, এই যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন।

শিষ্যের মস্তকে করার্পণ করে রোহিত প্রসন্নবদনে বললেন, ওহে ডম্বরু, তুমি পঁচিশ বৎসর আমার যে সেবা করেছ তাই প্রচুর দক্ষিণা, অর্থে আমার প্রয়োজন নেই। আমি জানি তুমি দরিদ্র, এই সুবর্ণখণ্ড তোমার পথের সম্বল হ'ক।

ডম্বরু বললেন, গুরুদেব, আপনার দয়ার সীমা নেই। যাত্রার পূর্বে আপনার কাছে আরও কিঞ্চিৎ বিদ্যা ভিক্ষা চাচ্ছি।

রোহিত সহাস্যে বললেন, বৎস, নিমজ্জিত কুম্ভের ন্যায় তুমি বিদ্যায় পরিপ্লুত হয়েছ, তোমার অন্তরে আর বিন্দুমাত্র ধারণের স্থান নেই। এখন কোনও গুণবান নৃপতিকে তুষ্ট করে তাঁর সভাকবি বা সভাপণ্ডিত হও। কিন্তু নির্বোধ আত্মগর্বী লোকের সংশ্রবে থেকো না, তাদের দানও নিও না।

ডম্বরু নতমস্তকে যুক্তকরে বললেন, গুরুদেব, আমাকে একটি উপাধি দেবেন না?

—কি উপাধি তুমি চাও?

—যদি যোগ্য মনে করেন তবে কৃপা করে আমাকে বিশ্ববিদ্যোদধি উপাধি দিন।

রোহিত হাস্য করে বললেন, তথাস্তু। হে পণ্ডিত ডম্বরু বিশ্ববিদ্যোদধি, তোমার সর্বত্র জয় হ'ক। দেবী সরস্বতী তোমাকে রক্ষা করুন, দেবগুরু বৃহস্পতি তোমাকে সুবুদ্ধি দিন।

পথে যেতে যেতে ডম্বরু একটি প্রশস্তি রচনা করলেন। কিছু দিন পর্যটনের পর তিনি শুনলেন কাশীরাজ বিতর্দন অতি গুণবান নৃপতি। তাঁরই আশ্রয়ে বাস করবেন এই স্থির করে ডম্বরু রাজসভায় উপস্থিত হয়ে এই প্রশস্তি পাঠ করলেন—

চন্দ্র সূর্য ম্লান তব যশের প্রভায়,
পরাজিত শত্রুকুল ছুটিয়া পালায়।
দেববৃন্দ হতমান নিরানন্দ অতি,
অসূয়ায় শয্যাগত ইন্দ্র সুরপতি।
উর্বশী মেনকা রম্ভা ছাড়ি স্বর্গধাম
তোমারে ঘিরিয়া নৃত্য করে অবিরাম।
পদ্মালয়া করেছেন তোমারে বরণ,
একাকী বৈকুণ্ঠে হরি করেন ক্রন্দন।
ডম্বরু পণ্ডিত আমি গাহি তব জয়,
মহারাজ, মোর প্রতি কিবা আজ্ঞা হয়?

কাশীরাজ বিতর্দন প্রীত হয়ে বললেন, বাঃ, অতি সুন্দর প্রশস্তি। কোষপাল, এই বিপ্রকে এক শত স্বর্ণমুদ্রা দাও।

ডম্বরু মাথা নেড়ে বললেন, না মহারাজ, নির্বোধ আত্মগর্বী লোকের দান আমি নিতে পারি না।

আশ্চর্য হয়ে রাজা বললেন, নির্বোধ আত্মগর্বী বলছ কাকে?

—আপনাকে। আমার প্রশস্তিতে যে উৎকট অত্যুক্তি আছে তা আপনি অম্লানবদনে মেনে নিয়েছেন।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিতর্দন বললেন, নির্বোধ আত্মগর্বী তুমি নিজে। যদি ব্রাহ্মণ না হতে তবে ধৃষ্টতার জন্য তোমাকে শূলে চড়াতাম। কোষপাল, এক রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে এই গণ্ডমূর্খকে বিদায় কর।

মুদ্রা না নিয়েই ডম্বরু কাশীরাজসভা ত্যাগ করলেন। তার পর বহু দিন পর্যটন করে বৎসরাজধানী কৌশাম্বী নগরীতে উপস্থিত হলেন এবং বৎসরাজ পুরঞ্জয়ের সভায় গিয়ে পূর্ববৎ প্রশস্তি পাঠ করলেন।

পুরঞ্জয় বললেন, অতি উত্তম রচনা। কোষপাল, এই পণ্ডিত-প্রবরকে এক শত স্বর্ণমুদ্রা দাও।

ডম্বরু পূর্ববৎ মাথা নেড়ে বললেন, না মহারাজ, নির্বোধ আত্ম-গর্বীর দান আমি নিতে পারি না, গুরুদেবের নিষেধ আছে। আমার প্রশস্তিতে যে উৎকট চাটুবাক্য আছে তা আপনি বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন।

ক্রুদ্ধ হয়ে পুরঞ্জয় বললেন, ওহে দ্বিজগর্দভ, দেবতা রাজা আর প্রণয়িনীর স্তুতিতে অতিরঞ্জন থাকেই, তা অলংকারশাস্ত্রসম্মত। আমি তোমার কবিত্বই বিচার করেছি, সত্যাসত্য গ্রাহ্য করি নি।

কোষপাল, এই কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ ব্রাহ্মণকে এক রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে বিদায় কর।

দক্ষিণা না নিয়েই ডম্বরু প্রস্থান করলেন। অনেক দিন পরে তিনি দশার্ণ দেশে উপস্থিত হলেন এবং সেখানকার রাজা উদায়ুধের সভায় গিয়ে পূর্ববৎ প্রশস্তি পাঠ করলেন।

উদায়ুধ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ওহে চাটুকার মিথ্যাভাষী ব্রাহ্মণ, ব্যাজস্তুতি দ্বারা তুমি আমার অপমান করেছ। দূর হও রাজ্য থেকে।

উৎফুল্ল হয়ে ডম্বরু বললেন, সাধু সাধু! মহারাজ, আপনার জয় হ'ক, আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, আমার প্রশস্তিতে যে অত্যুক্তি আছে তা মেনে নেন নি। আপনি নির্বোধ নন, আত্মগর্বীও নন, তবে উদ্ধত বটে। আমি আপনারই আশ্রয়ে বাস করব। আমার সংসারযাত্রার জন্য যথোচিত বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিন এবং একটি সুলক্ষণা সুপাত্রীও যোগাড় করে দিন যাকে বিবাহ করে আমি গৃহী হতে পারি।

অট্টহাস্য করে উদায়ুধ বললেন, হে পণ্ডিতমূর্খ, তোমার স্পর্ধা কম নয় যে আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছ! তোমার তুল্য ধৃষ্ট কপটভাষী পুরুষকে আমি আশ্রয় দিতে পারি না। কোষপাল, দশ রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে এই উন্মাদকে বিদায় কর।

ডম্বরু মুদ্রা নিলেন না।

ক্ষুব্ধ ডম্বরু আবার পথ চলতে লাগলেন। তাঁর সম্বল সেই ক্ষুদ্র সুবর্ণখণ্ড বিক্রয় করে যে অর্থ পেয়েছিলেন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। অপরাহ্ণকালে অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে

তিনি মালব রাজ্যে উপস্থিত হলেন। শিপ্রা নদীর তীরে এসে ডম্বরু ভাবতে লাগলেন, অহো দুরদৃষ্ট! রাজাদের পরীক্ষার জন্য আমি যে উপায় অবলম্বন করেছিলাম তা বিফল হয়েছে, দুই রাজা নির্বোধ প্রতিপন্ন হয়েছে, তৃতীয় রাজা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও অকারণে আমার প্রতি বিমুখ হয়েছেন। এখন কি করা যায়? হে দেবী সরস্বতী, আমাকে রক্ষা কর।

নদীতীরে উপবিষ্ট হয়ে ডম্বরু ব্যাকুল মনে বাগ্‌দেবীকে ডাকতে লাগলেন। সহসা শুনতে পেলেন, মধুর কণ্ঠে কে বলছে — দ্বিজবর, আপনি কি বিপদাপন্ন?

চমকিত হয়ে ডম্বরু দেখলেন, এক সদ্যঃস্নাতা সিক্তবসনা সুন্দরী তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে ডম্বরু বললেন, ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে! আমাকে রক্ষা কর।

বীণানিক্কণের ন্যায় হাস্য করে সুন্দরী বললেন, দেবী টেবী নই, আমি সামান্যা শিল্পিনী। আমার নাম শিলীন্ধ্রী, রাজপুরীর অঙ্গনাদের জন্য পুষ্পালংকার রচনা করে জীবিকা নির্বাহ করি। নদীতে স্নান করে উঠে দেখলাম আপনি কাতরোক্তি করছেন। দয়া করে বলুন কি হয়েছে।

ডম্বরু বললেন, আমি বৃহস্পতিকল্প আচার্য রোহিতের প্রিয় শিষ্য পণ্ডিত ডম্বরু বিশ্ববিদ্যোদধি। নিখিল শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে সম্প্রতি গুরুর আশ্রম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছি। তিনি বলেছেন, বৎস, তুমি বিদ্যায় পরিপ্লুত হয়েছ, এখন কোনও নৃপতিকে তুষ্ট করে তাঁর সভাকবি বা সভাপণ্ডিত হও, কিন্তু নির্বোধ আর আত্মগর্বী লোকের সংশ্রবে থেকো না, তাদের দানও নিও না। আমি একে একে কাশীরাজ বৎসরাজ ও দশার্ণরাজের সকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁদের পরীক্ষা করেছি, কিন্তু দেখলাম প্রথম দুই রাজা নির্বোধ আত্মগর্বী, এবং

তৃতীয় রাজা বুদ্ধিমান হলেও অত্যন্ত উদ্ধত ও ক্রোধী, আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি এখন নিঃস্ব শ্রান্ত ক্ষুধাতুর, কি করা উচিত স্থির করতে পারছি না।

শিলীন্ধ্রী বললেন, আপনি দয়া করে আমার কুটীরে এসে বিশ্রাম ও ক্ষুন্নিবৃত্তি করুন। সংকোচ করবেন না, আমি আমার বৃদ্ধা জননীর সহিত বাস করি। কাল অবন্তীরাজের সভায় যাবেন। তিনি অতি বুদ্ধিমান নরপতি, নিশ্চয় আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করবেন।

ডম্বরু বললেন, ভদ্রে, আমি আজই অবন্তীরাজের কাছে গিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করতে চাই। যদি সফলকাম হই তবেই তোমার আতিথ্য গ্রহণ করব, নতুবা দেবী সরস্বতীর আরাধনায় প্রায়োপবেশনে প্রাণ বিসর্জন দেব।

শিলীন্ধ্রী প্রশ্ন করলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি নৃপতিদের কিরূপে পরীক্ষা করেছিলেন?

ডম্বরু আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন। শিলীন্ধ্রী স্মিতমুখে বললেন, পণ্ডিতবর, আপনি মিথ্যা প্রিয়বাক্য বলেছিলেন সেজন্য অভীষ্ট ফল পান নি। অবন্তীরাজ তীক্ষ্ণবুদ্ধি গুণগ্রাহী, তাঁর কাছে গিয়ে আপনি সত্যভাষণ করুন, তাঁর দোষ গুণ সবই কীর্তন করুন।

ডম্বরু বললেন, সুন্দরী, তোমার মন্ত্রণা মন্দ নয়, মিথ্যা স্তুতি করে তিন বার ব্যর্থকাম হয়েছি, এবারে সত্য স্তুতি করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু এদেশের রাজার দোষ গুণ আমি কিছুই জানি না, সত্যভাষণ কি করে করব?

শিলীন্ধ্রী বললেন, ভাববেন না, আমি আপনাকে সমস্ত শিখিয়ে দিচ্ছি। একটু পরেই মহারাজ সান্ধ্যসভায় সমাসীন হবেন, আপনি সেখান চলুন. আপনাকে পথ দেখিয়ে দেব।

ডম্বরুকে উপদেশ দিতে দিতে কিছু দূর তাঁর সঙ্গে গিয়ে শিলীন্ধ্রী বললেন, বামে ওই কুঞ্জবনের মধ্যে আমার গৃহ। দক্ষিণের ওই পথ রাজভবনের সিংহদ্বারে শেষ হয়েছে, আপনি সোজা চলে যান।

শিলীন্ধ্রী প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

মালবরাজ বিক্রমাদিত্য তাঁর রাজধানী অবন্তী অর্থাৎ উজ্জয়িনীর সভা অলংকৃত করে বসে আছেন। দৈনিক রাজকার্য তিনি প্রাতঃকালীন সভাতেই সম্পন্ন করে থাকেন, এখন এই সান্ধ্যসভায় চিত্তবিনোদনের জন্য সভাসদ্‌বর্গের সহিত মিলিত হয়েছেন।

রুক্ষকেশ মলিনবেশ ধূলিধূসরদেহ ডম্বরু রাজসভায় প্রবেশ করলেন, ব্রাহ্মণ দেখে কেউ তাঁকে বাধা দিল না। রাজার সম্মুখে এসে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে করতল বিন্যস্ত করে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হল না।

রাজা বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনাকে অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত দেখছি। আপনি হস্ত পদ মুখ প্রক্ষালন করুন, দুগ্ধপান করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন, তার পর সুস্থ হলে আপনার বক্তব্য বলবেন। প্রতিহারী, এই বিপ্রকে বিশ্রামকক্ষে নিয়ে গিয়ে সেবার ব্যবস্থা কর।

ডম্বরু বললেন, মহারাজ, আমি সংকল্প করেছি, আমার বক্তব্য শুনে যদি আপনি প্রসন্ন হন তবেই জলস্পর্শ করব। অতএব যা বলছি অবধান করুন—

মহাবল মহামতি বিক্রম ভূপতি,
তব রাজ্যে প্রজাগণ সুখে আছে অতি।

শিষ্ট জন দুগ্ধ ঘৃত মৎস্য মাংসে তুষ্ট,
শূলে চড়িয়াছে যত দুরাচার দুষ্ট।
বহু জ্ঞানী গুণী আছে আশ্রয়ে তোমার,
অধিকন্তু কতিপয় আছে চাটুকার।
আছে নবরত্ন তব যশস্বী প্রচণ্ড,
যদিও কয়েক জন শুধু কাচখণ্ড।
আছে তব তিন ভার্যা মহিষী প্রেয়সী,
দশ উপভার্যা নৃত্যগীতপটীয়সী।
তথাপি অবলা বালা শিলীন্ধ্রীর প্রতি
কেন তব লোভ ওহে প্রৌঢ় নরপতি?
বিশ্ববিদ্যোদধি আমি ডম্বরু পণ্ডিত,
নির্ভয়ে কহিয়া থাকি যাহা সমুচিত।
নিবেদন করিলাম লোকে যাহা কয়,
মহারাজ, মোর প্রতি কিবা আজ্ঞা হয়?

ডম্বরুর ভাষণ শুনে বিক্রমাদিত্যের গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল আরক্ত হল। নবরত্নসভার দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনারা কি বলেন?

বেতালভট্ট বললেন, মহারাজ, এই বিশ্ববিদ্যোদধির উপযুক্ত পুরস্কার—মস্তকমুণ্ডন, দধিলেপন ও গর্দভবাহনে বহিষ্কার।

রাজা আবার প্রশ্ন করলেন, কবি কালিদাস কি বলেন?

কালিদাস বললেন, মহারাজ, অনুমতি দিন এই ব্রাহ্মণকে আমি অন্তরালে নিয়ে যাই। কিছুক্ষণ পরে আবার এঁকে আপনার সকাশে আনব।

রাজা অনুমতি দিলেন। ডম্বরুর হাত ধরে কালিদাস বললেন,

পণ্ডিত, এস আমার সঙ্গে। মাথা নেড়ে হাত টেনে ডম্বরু বললেন, রাজার অভিপ্রায় না জেনে আমি পাদমেকং ন গচ্ছামি।

ডম্বরুর কানে কানে কালিদাস বললেন, রাজা প্রসন্ন হয়েছেন। আমার সঙ্গে এস, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

দুই দণ্ড কাল অতীত হলে কালিদাস রাজসভায় ফিরে এলেন, তাঁর পশ্চাতে দু জন রাজভৃত্য ডম্বরুকে ধরাধরি করে এনে রাজার সম্মুখে অর্ধশয়ান অবস্থায় রাখল। ডম্বরুর দেহ পরিষ্কৃত, মস্তক তৈলাক্ত, উদর স্ফীত, চক্ষু অর্ধনিমীলিত।

উদ্‌বিগ্ন হয়ে বিক্রমাদিত্য প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে এই ব্রাহ্মণের?

কালিদাস বললেন, ভয় নেই মহারাজ। এই ডম্বরু পণ্ডিত পথশ্রমে ও ক্ষুধায় অবসন্ন ছিলেন, তার ফলে এঁর কিঞ্চিৎ বুদ্ধি-ভ্রংশও হয়েছিল। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে ইনি স্নান ক'রে নব বস্ত্র প'রে খাদ্য গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘ উপবাসের পর গুরুভোজনের জন্য ইনি উত্থানশক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। তথাপি এঁর ভাষণের পরিশিষ্টস্বরূপ আরও কিছু আপনাকে এখনই নিবেদন করতে চান।

—বেশ তো, কি বলতে চান বলুন না।

—মহারাজ, আকণ্ঠ দধি চিপিটক রম্ভা লড্ডু ভোজনের ফলে এঁর বাক্‌শক্তিও এখন লোপ পেয়েছে, অথচ নিজের বক্তব্য জানাবার জন্য ইনি ব্যগ্র। যদি অনুমতি দেন তবে এঁর প্রতিনিধি হয়ে আমিই নিবেদন করি।

বিক্রমাদিত্য অনুমতি দিলেন। ডম্বরুর পূর্ব ইতিহাস বিবৃত করে কালিদাস বললেন, মহারাজ, এই ডম্বরু পণ্ডিত বিশ্ববিদ্যোদধি

হলেও অতি সরলমতি এবং লোকব্যবহারে অনভিজ্ঞ। রাজসভায় আসার পূর্বে দুর্দৈবক্রমে শিলীন্ধ্রীর সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই ব্যাপিকা প্রগল্‌ভা দুর্বিনীতা রমণী এঁকে যা শিখিয়েছে তাই ইনি শুক পক্ষীর ন্যায় আবৃত্তি করেছেন।

রাজা বললেন, ডম্বরু তাঁর ভ্রম বুঝতে পেরেছেন?

—মহারাজ, ডম্বরু বলতে চান, আপনার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকায় শিলীন্ধ্রীর বাক্যই উনি মেনে নিয়েছিলেন। এখন উদরপূর্তির পর ইনি বুঝেছেন যে পরপ্রত্যয়ে চালিত হওয়া মূঢ়বুদ্ধির লক্ষণ। অতএব ইনি আপনার আশ্রয়ে থেকে আপনার সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করে যথার্থ প্রশস্তি রচনা করতে চান। আপনি কৃপা করে ডম্বরুর প্রার্থনা পূরণ করুন, এঁকে অন্যতম সভাসদের পদ দিন।

—কোন্‌ কর্মের ইনি যোগ্য?

—মহারাজ, আপনার সভায় বিদূষক নেই, ডম্বরুকে বিদূষক নিযুক্ত করুন।

—বলেন কি! ইনি তো শুষ্ককাষ্ঠতুল্য নীরস, কৌতুকের কিছু-মাত্র বোধ আছে মনে হয় না।

—মহারাজ, কৌতুক উৎপাদনের সহজাত শক্তি এঁর আছে, নিজের অজ্ঞাতসারেই ইনি আপনার এবং এই রাজসভার সকলের মনোরঞ্জন করতে পারবেন, যেমন আজ করেছেন।

রাজা সহাস্যে বললেন, উত্তম প্রস্তাব। ওহে ডম্বরু পণ্ডিত, তোমাকে বিদূষকের পদ দিলাম। মন্ত্রী, কবি কালিদাসের সঙ্গে পরামর্শ করে তুমি ডম্বরুর জন্য উপযুক্ত বৃত্তি ও বাসগৃহের ব্যবস্থা করে দাও।

এতক্ষণে ডম্বরু কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করলেন। চক্ষু উন্মীলিত করে হাতে ভর দিয়ে উঠে বললেন, মালবপতি মহামতি বিক্রমাদিত্যের

জয়! মহারাজ, আমার আর একটি প্রার্থনা আছে। গুরুদেব আমাকে গৃহী হতে বলেছেন, অতএব আমার জন্য একটি সুলক্ষণা সৎ-কুলোদ্ভবা সুবিনীতা সুপাত্রীর সন্ধানের আজ্ঞা হ'ক।

বিক্রমাদিত্য তাঁর দণ্ডনায়ককে সম্বোধন করে বললেন, ওহে বীরভদ্র, এই ব্রাহ্মণের জন্য একটি সুপাত্রীর সন্ধান কর। আর, শিলীন্ধ্রীনাম্নী যে রমণী আমার মহিষীদের জন্য পুষ্পালংকার রচনা করে, তাকে রাজনিন্দার অপরাধে দণ্ড দাও—মস্তকমুণ্ডন, দধিলেপন, এবং গর্দভারোহণে বহিষ্কার।

ব্যাকুল হয়ে ডম্বরু বললেন, মহারাজ, বুদ্ধিহীনা অবলা সরলা বালার অপরাধ মার্জনা করুন।

রাজা বললেন, ওহে বীরভদ্র, এই ডম্বরু পণ্ডিত যদি সেই দুর্বিনীতা নারীর পাণিগ্রহণ করেন তবে তাকে নিষ্কৃতি দেবে।

ডম্বরু পাণিগ্রহণ করেছিলেন।

১৮৭৮

দুই সিংহ

বেচারাম সরকার খুব ধনী লোক, যুদ্ধের সময় কনট্রাক্টারি করে প্রচুর রোজগার করেছেন। এখন তাঁর কারবার বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু তার জন্যে খেদও নেই। বেচারামের লোভ অসীম নয়, তিনি থামতে জানেন। যা জমিয়েছেন তাতেই তিনি তুষ্ট, বরং ব্যবসার ঝঞ্ঝাট আর পরিশ্রম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এখন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।

বেচারাম সুশিক্ষিত নন। তাঁর পত্নী সুবালা সেকেলে পাড়াগেঁয়ে মহিলা, একটু আধটু গল্পের বই পড়েন, তাও সব বুঝতে পারেন না। তাঁদের দুই সন্তান সুমন্ত আর সুমিত্রা কলেজে পড়ছে, তাদের রুচি আধুনিক, বাপ-মায়ের কথাবার্তা আর চালচলনে লজ্জা পায়। তারা স্পষ্টই বলে—বাবা কেবল টাকাই রোজগার করেছেন, শুধু পঞ্জাবী গুজরাটী মারোয়াড়ী আর বড়-সায়েব ছোট-সায়েবদের সঙ্গে মিশেছেন, কালচার কৃষ্টি সংস্কৃতি কাকে বলে জানেন না। আর মা তো কেবল সেকরা আর গহনা আর গোছা গোছা পান আর জরদা-সুরতি নিয়েই আছেন। বাবা, তুমি তোমার ওই সেকেলে ঝোলা গোঁফটা কামিয়ে ফেল, চুল ব্যাক-ব্রশ করতে শেখ। এখনও তো তেমন বুড়ো হও নি, একটু স্মার্ট হও। আর মা, তোমার দাঁতের দিকে তো চাওয়া যায় না, পান-দোক্তা খেয়ে আতা-বিচির মতন কালো করেছ। সব তুলে ফেলে নতুন দাঁত বাঁধাও। আর তো বাবার কাজের চাপ নেই, এখন তোমরা দুজনে চালচলন বদলাও, সভ্য সমাজে যাতে মিশতে পার তার চেষ্টা কর।

বেচারাম আর সুবালা অতি সুবোধ বাপ-মা। ছেলেমেয়ের কথা

শুনে হেসে বললেন, বেশ তো, এতদিন আমরা তোদের মানুষ করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি, এখন তোরাই আমাদের তালিম দিয়ে সভ্য করে নে।

বাপ-মাকে অভিজাত সভ্য সমাজের যোগ্য করবার জন্যে ছেলে-মেয়ে উঠে-পড়ে লেগে গেল। বিখ্যাত ক্লাব 'সজ্জন সংগতি'র নাম আপনারা শুনে থাকবেন। তার সেক্রেটারি কপোত গুহ বার-অ্যাট-ল আর তাঁর স্ত্রী শিঞ্জিনী গুহর সঙ্গে সুমন্ত আর সুমিত্রার আলাপ আছে। দুজনে গুহ দম্পতিকে ধরে বসল তাঁরা যেন বেচারাম আর সুবালাকে পালিশ করবার ভার নেন। কপোত আর শিঞ্জিনী সানন্দে রাজী হলেন এবং বেচারামের বাড়িতে ঘন ঘন আসতে লাগলেন। কর্তার তালিমের ভার মিস্টার গুহ আর গিন্নীর ভার মিসিস গুহ নিলেন। বেচারাম কৃপণ নন, নিজেদের শিক্ষার জন্যে উপযুক্ত মাসিক দক্ষিণার প্রস্তাব করলেন। কপোত গুহ প্রথমে ভদ্রোচিত কুণ্ঠা প্রকাশ করে অবশেষে নিতে রাজী হলেন। ঘর সাজানো, খাবার ব্যবস্থা, পোশাক, গহনা, কথাবার্তার কায়দা, সব বিষয়েই সংস্কারের চেষ্টা হতে লাগল। বেচারাম গোঁফহীন হলেন, ব্যাক-ব্রশ করলেন, বাড়িতে ধুতির বদলে ইজার পরতে লাগলেন। কিন্তু সুবালা কিছুতেই পান-দোক্তা ছাড়লেন না, দাঁত বাঁধাতেও রাজী হলেন না। শিঞ্জিনী বার বার সতর্ক করে দিলেও সুবালার গ্রাম্য উচ্চারণ দূর হল না।

সম্প্রতি বিম্বিসার রোডে বেচারামবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ি হয়েছে, তার প্ল্যান কপোত গুহই আগাগোড়া দেখে দিয়েছেন। গৃহপ্রবেশ হয়ে যাবার কিছুদিন পরে সুমন্ত বলল, বাবা, এবারে বাড়িতে একটা পার্টি লাগাও। তোমার আত্মীয় কুটুম্ব বড়-সায়েব ছোট-সায়েব

লোহাওয়ালা সিমেণ্টওয়ালা ওরা তো সেদিন চর্ব্য চূষ্য ভোজ খেয়ে গেছে, ওদের ডাকবার দরকার নেই। পার্টিতে শুধু বাছা বাছা লোক নিমন্ত্রণ কর।

বেচারাম বললেন, আমার তো বাপু রাজা-রাজড়া আর বনেদী লোকের সঙ্গে আলাপ নেই, গায়ে পড়ে নিমন্ত্রণ করতেও পারি না। দু-একজন মন্ত্রী-উপমন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় আছে, তাঁদের বলতে পারি। গুহ সায়েব কি বলেন?

কপোত গুহ বললেন, অ্যারিস্টোক্রাটদের এখন নাই বা ডাকলেন, দিন কতক পরে তারা নিজেরাই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে ব্যস্ত হবে। আমি বলি কি, বাড়িতে নামজাদা হোমরাচোমরা সাহিত্যিকদের একটা সম্মিলন করুন, জাঁকালো টি-পার্টি। যদি দু-একটি সিংহ আনবার ব্যবস্থা হয় তবে সকলেই খুব আগ্রহের সঙ্গে আসবেন।

—বলেন কি মিস্টার গুহ, সিংহ কোথায় পাব?

—সিংহ বুঝলেন না? যাকে বলে লায়ন। অর্থাৎ খুব নামজাদা গুণী লোক, যাকে সবাই দেখতে চায়।

সুমন্ত বলল, লায়নের চাইতে লায়নেস আরও ভাল। যদি দু-একটি এক নম্বরের সিনেমা স্টার আনতে পারেন, এই ধরুন হ্ল্যাদিনী মণ্ডল আর মরালী ব্যানার্জি—

কপোত গুহ মাথা নেড়ে বললেন, ঘরোয়া পার্টিতে ও রকম সিংহিনী আনা চলবে না, আমাদের সমাজ এখনও অতটা উদার হয় নি। তা ছাড়া সাহিত্যিকদের মধ্যে বুড়ো অনেক আছেন, তাঁরা একটু লাজুক, হয়তো অস্বস্তি বোধ করবেন। সাহিত্যিক সিংহিনী পাওয়া গেলে ভাল হত, কিন্তু এখন তাঁরা দুর্লভ। কবে পার্টি দিতে চান?

সুমন্ত আর সুমিত্রা বলল, সরস্বতী পুজোর দিন পার্টি লাগান, বেশ হবে।

কপোত গুহ বললেন, উঁহু, সেদিন চলবে না, সাহিত্যিক সুধীদের নানা জায়গায় বাণীবন্দনায় যেতে হবে। দু-তিন দিন পরে করা যেতে পারে।

বেচারাম বললেন, বেশ, পঁচিশে জানুআরি হল রবিবার, সেই দিনই পার্টি দেওয়া যাক। কাকে কাকে ডাকবেন?

—শিঞ্জিনীর সঙ্গে পরামর্শ করে ফর্দ করব। বেশী নয়, জন পঁচিশ-ত্রিশ হলেই বেশ হবে। এখন যাঁদের নাম মনে পড়ছে বলি শুনুন। বটেশ্বর সিকদার আর দামোদর নশকর গল্পসরস্বতী এঁরাই হলেন এখনকার লিটেরারি লায়ন, এই দুই সিংহকে আনতেই হবে।

সুমিত্রা বলল, ওঁদের দুজনের বনে না শুনেছি।

—তাতে ক্ষতি হবে না, এখানে পার্টিতে এসে তো ঝগড়া করতে পারবেন না। তার পর গিয়ে রাজলক্ষ্মী দেবী সাহিত্যভাস্বতীকে বলতে হবে, উনি সিংহিনী না হলেও ব্যাঘ্রিনী বটেন। সেকেলে আর একেলে কবি গোটা চারেক হলেই চলবে, কবিদের আকর্ষণ গল্পওয়ালাদের চাইতে ঢের কম। প্রগামিণী পত্রিকার সম্পাদক অনুকূল চৌধুরী মশায়কে সভাপতি করা যাবে। আর কালাচাঁদ চোঙদারকে তো বলতেই হবে।

সুমন্ত প্রশ্ন করল, তিনি আবার কে?

—জান না? দুন্দুভি পত্রিকার সম্পাদক।

সুমিত্রা বলল, সেটা তো শুনেছি একটা বাজে পত্রিকা।

—মোটেই বাজে নয়, বিস্তর পাঠক। প্রতি সংখ্যায় বাছা বাছা নামজাদা লেখকদের গালাগাল দেওয়া হয়, লোকে খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ে।

—পাঠকরা রাগ করে না?

—রাগ করবে কেন। নামী লোকের নিন্দে সকলেরই ভাল লাগে। সেকালে যে সব পত্রিকা রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করত তাদের বিস্তর পাঠক জুটত। কবির ভক্তরাও পড়ে বলত, হে হে হে, কি মজার লিখেছে দেখ! তবে কালাচাঁদ চোঙদারের একটা প্রিনসিপ্‌ল আছে, ছোটখাটো লেখকদের গ্রাহ্য করে না, আর যে সব বড় বড় লেখক নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি দেন তাঁদেরও রেহাই দেয়।

—বার্ষিক বৃত্তি কি রকম? ব্ল্যাকমেল নাকি?

—তা বলতে পার। শুনেছি দামোদর নশকর প্রতি বৎসর পুজোর সময় কালাচাঁদকে আড়াই শ টাকা দেন। উনি যে গল্পসরস্বতী উপাধি পেয়েছেন তা কালাচাঁদেরই চেষ্টায়। বটেশ্বর সিকদার এক-গুঁয়ে কঞ্জুস লোক, এক পয়সা দেন না, তাই দুন্দভির প্রতি সংখ্যায় তাঁকে গালাগাল খেতে হয়। তবে কালাচাঁদ উপকারও করে। জন তিন-চার ছোকরা কতকগুলো অশ্লীল বই লিখেছিল, কিন্তু তেমন কাটতি হয় নি। তারা কালাচাঁদকে বলল, দয়া করে আপনার পত্রিকায় আমাদের ভাল করে গালাগাল দিন, আমাদের লেখা থেকে চয়েস প্যাসেজ কিছু কিছু তুলে দিন। বেশী দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই, পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি, তাই নিন সার। কালাচাঁদ রাজী হল, তার ফলে সেই বই-গুলোর কাটতি খুব বেড়ে গেল। তার পর গিয়ে দামামা পত্রিকার সম্পাদক গোরাচাঁদ সাঁপুইকেও বলতে হবে। সে ছোকরা ব্ল্যাকমেল নেয় না, তবে বড়লোক লেখকদের টাকা খেয়ে তাদের রাবিশ রচনার প্রশংসা ছাপে, তা ছাড়া প্রতি সংখ্যায় কালাচাঁদকে চুটিয়ে গাল দেয়। যাক ও সব কথা। আমি কালকেই ফর্দ করে ফেলব—কাদের ডাকতে হবে, কি খাওয়ানো হবে, বসবার কি রকম ব্যবস্থা হবে—সবই স্থির করে ফেলব।

নির্দিষ্ট দিনে প্রীতিসম্মিলন বা টি-পার্টির আয়োজন হল। বাড়ির সামনের মাঠে শামিয়ানা খাটানো হয়েছে, ছোট ছোট টেবিলের চার পাশে চেয়ার সাজিয়ে নিমন্ত্রিতদের চা খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। শামিয়ানার এক দিকে বেদীর উপর সভাপতি অনুকূল চৌধুরী, দুই সিংহ অর্থাৎ প্রধান অতিথি বটেশ্বর আর দামোদর,, রাজলক্ষ্মী দেবী, এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লোক বসবেন। সভায় বক্তৃতা বিশেষ কিছু হবে না, শুধু বেচারাম অভ্যাগতদের স্বাগত জানাবেন, তার পর অনুকূল চৌধুরী গৃহস্বামীর কিঞ্চিৎ গুণকীর্তন করে তাঁর সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেবেন। আশা আছে বটেশ্বর আর দামোদরও বেচারামের কৃতিত্ব আর বদান্যতা সম্বন্ধে কিছু বলবেন।

সভাপতি এবং দুই সিংহের জন্যে তিনটি ভাল চেয়ার আনা হয়েছে, একটি মাইসোরের চন্দন কাঠের আর দুটি কাশ্মীরী আখরোট অর্থাৎ ওআলনট কাঠের। প্রথম চেয়ারটির পিছন দিকে একটু বেশী উঁচু আর নকশাদার, সেজন্যে খুব জাঁকালো দেখায়। কপোত গুহ একই রকম তিনটি চেয়ার আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু যোগাড় করতে পারেন নি। শামিয়ানার নেপথ্যে চড়কডাঙা স্ট্রিংব্যাণ্ডের তিন-জন বেহালাবাদক মোতায়েন আছে। তারা খুব আস্তে বাজাবে, যাতে অতিথিদের কথাবার্তার ব্যাঘাত না হয়।

নিমন্ত্রিত লোকেরা ক্রমে ক্রমে এসে পৌঁছুলেন। বেচারাম, তাঁর ছেলে-মেয়ে, এবং কপোত আর শিঞ্জিনী গুহ অতিথিদের সমাদর করে বসিয়ে দিলেন। বেচারাম-গৃহিণী সুবালা কিছুতেই এই দলের মধ্যে থাকতে রাজী হলেন না, তিনি রাজলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে ফিসফিস করে একটু আলাপ.করেই সরে পড়লেন এবং মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন। প্রায় সকলের শেষে বটেশ্বর সিকদার আর দামোদর নশকর উপস্থিত হলেন। দৈবক্রমে এঁদের আগমন এক সঙ্গেই হল, প্রত্যেকের

সঙ্গে গুটি কতক কমবয়সী খাস ভক্তও এল। বেচারাম আর কপোত সসম্ভ্রমে অভিনন্দন করে দুই মহামান্য সিংহকে শামিয়ানার ভিতরে নিয়ে গেলেন।

সভাপতি অনুকূল চৌধুরী আগেই এসেছিলেন। তিনি একটি কাশ্মীরী চেয়ারে বসলেন। বটেশ্বর বয়সে বড়, সেজন্য কপোত গুহ তাঁকে চন্দন কাঠের চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। সুমিত্রা তাঁর গলায় একটি মোটা রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে দিল। পাশের কাশ্মীরী চেয়ারটা দেখিয়ে কপোত গুহ দামোদরকে বললেন, বসতে আজ্ঞা হক। দামোদর বসলেন না, মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কপোত গুহ আবার বললেন, দয়া করে বসুন সার। দামোদর ভ্রূকুটি করে উত্তর দিলেন, ও চেয়ারে আমি বসতে পারি না।

সভায় একটা গুঞ্জন উঠল। জন কতক অতিথি দুই সিংহের কাছে এগিয়ে এলেন। দুন্দুভি-সম্পাদক কালাচাঁদ চোঙদার বলল, দামোদর-বাবু এই দু নম্বর চেয়ারে কিছুতেই বসতে পারেন না, তাতে এঁর মর্যাদার হানি হবে, ইনিই এখনকার সাহিত্যসম্রাট। বটেশ্বরবাবুর প্রতি আমি কটাক্ষ করছি না, তবে আমরা চাই উনি ওই ভাল চেয়ারটি দামোদরবাবুর জন্যে ছেড়ে দিন।

দামামা-সম্পাদক গৌরচাঁদ সাঁপুই চেঁচিয়ে বলল, খবরদার বটেশ্বরবাবু, উঠবেন না, গট হয়ে বসে থাকুন। এখনকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট আপনিই।

কালাচাঁদ বলল, ননসেন্স। দামোদরবাবুর উপাধি আছে গল্প-সরস্বতী, বটেশ্বরের কি আছে শুনি? ঘোড়ার ডিম।

গৌরচাঁদ বলল, এই কথা? ওহে ভূপেশ রাজেন অবনী নুরুদ্দিন নবকেষ্ট, এগিয়ে এস তো। আমরা ছ জন ছোট-গাল্পিক, বড়-গাল্পিক, রম্য-লিখিয়ে, কবি, সম্পাদক আর সমালোচক—আমরা নিখিল

বাঙালী সাহিত্যিকবর্গের প্রতিনিধিরূপে অত্র সভায় অস্মিন মুহূর্তে শ্রীযুক্ত বটেশ্বর সিকদার মহাশয়কে উপাধি দিলাম—অপ্রতিদ্বন্দ্বী গল্পশিল্পসম্রাট। যার সাহস আছে সে আপত্তি করুক। আমার দস্তানা নেই, এই বাঁ পায়ের মোজাটা খুলে ফেলে চ্যালেঞ্জ করছি, আমার সঙ্গে যে লড়তে চায় সে মোজা তুলে নিক। সবতাতে আমি রাজী আছি—ঘুষি, গাঁট্টা, লাঠি, থান ইট, যা চাও।

মোজা তুলে নিতে কেউ এগিয়ে এল না। গৌরচাঁদ বলল, নুরু ভাই, জোরসে শাঁখ বাজা। নুরুদ্দিনের মুখ থেকে বিজয়সূচক কৃত্রিম শঙ্খধ্বনি নির্গত হল—পোঁ-ও-ও।

কালাচাঁদ চিৎকার করে বলল, বটেশ্বরবাবু, ভাল চান তো এখনই চেয়ার ভেকেট করুন। কি, উঠবেন না? ও দামোদরবাবু, দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন, আপনার হকের আসন দখল করুন, এই চেয়ারটাতেই আপনি বসে পড়ুন।

দামোদর বললেন, ওতে বসবার জায়গা কই?

কালাচাঁদ আর তার দু জন বন্ধু দামোদরকে ধরে বটেশ্বরের কোলের উপর বসিয়ে দিয়ে বলল—খবরদার উঠবেন না, আমরা আপনাকে ব্যাক করব। এই বুড়ো বটেশ্বর কতক্ষণ আপনার আড়াই-মনী বপু ধারণ করতে পারে দেখা যাক।

হট্টগোল আরম্ভ হল। রাজলক্ষ্মী সাহিত্যভাস্বতী বললেন, ছি ছি ছি, আপনাদের লজ্জা নেই, ছোট ছেলের মতন ঝগড়া করছেন! দু জনেই নেমে পড়ুন চেয়ার থেকে, আসুন আমরা সবাই চায়ের টেবিলে গিয়ে বসি।

কালাচাঁদ বলল, কারও কথা শুনবেন না দামোদরবাবু, গ্যাঁট হয়ে বটেশ্বরের কোলে বসে থাকুন।

গৌরচাঁদ বলল, ঠেলা মেরে দামোদরকে ফেলে দিন বটেশ্বরবাবু, চিমটি কাটুন, কাতুকুতু দিন।

সমাগত অতিথিদের এক দল বটেশ্বরের পক্ষে আর এক দল দামোদরের পক্ষে হল্লা করতে লাগল। অবশেষে মারামারির উপক্রম হল। অনুকূল চৌধুরী হাত জোড় করে দুই দলকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না।

কপোত গুহ চুপি চুপি বেচারামকে বললেন, গতিক ভাল নয়, পুলিসে খবর দেওয়া যাক, কি বলেন?

সুমন্ত বলল, উঁহু, বরং ফায়ার ব্রিগেডে টেলিফোন করি, হোজ পাইপ থেকে জলের তোড় গায়ে লাগলে দুই সিংগি আর সব কটা শেয়াল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সুমিত্রা বলল, ও সবের দরকার নেই, বিশ্রী একটা স্ক্যাণ্ডাল হবে। লড়াই থামাবার ব্যবস্থা আমি করছি। এই বলে সে সভা ছেড়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির ফটকের বাইরে গেল।

বেচারাম সরকারের বাড়ির পাশে একটা খালি জমি আছে, পাড়ার জয়-হিন্দ ক্লাবের ছেলেরা সেখানে পাণ্ডাল খাড়া করে খুব জাঁকিয়ে বাণীবন্দনা করেছে। তিন দিন আগে পুজো চুকে গেছে, কিন্তু ফুর্তির জের টানবার জন্যে এ পর্যন্ত বিসর্জন হয় নি, আজ সন্ধ্যায় তার আয়োজন হচ্ছে। পাণ্ডালের ভিতর থেকে দেবীমূর্তি বার করা হয়েছে। লাউড স্পীকারটা মাটিতে নামানো হয়েছে, কিন্তু বিজলীর তার খোলা হয় নি, এখনও একটানা রেকর্ড-সংগীত উদ্‌গিরণ করছে। সামনে একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে। গুটিকতক

ছেলে-মেয়ে মুখোশ পরে তৈরী হয়ে আছে, তারা চলন্ত লরির উপর দেবীমূর্তির সামনে নাচবে।

এই জয়-হিন্দু ক্লাবের পুজোয় বেচারামবাবু মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছেন, অন্য রকমেও অনেক সাহায্য করেছেন, সেজন্যে তাঁর বাড়ির সবাইকে ক্লাবের ছেলেরা খুব খাতির করে। সেক্রেটারি প্রাণধন নাগের কাছে এসে সুমিত্রা বলল, দেখুন, বাড়িতে মহা বিপদ, আপনাদের সাহায্য চাচ্ছি—

ব্যস্ত হয়ে প্রাণধন বলল, কি করতে হবে হুকুম করুন, সব তাতে রেডি আছি, আমরা যথাসাধ্য করব, যাকে বলে আপ্রাণ।

সুমিত্রা সংক্ষেপে জানাল, তাদের বাড়ির পার্টিতে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে জনকতক গুন্ডা মারামারির মতলবে আছে। দুই সিংহ অর্থাৎ প্রধান অতিথি একই চেয়ারে বসেছেন, তাঁদের রোখ চেপে গেছে কেউ চেয়ারের দখল ছাড়বেন না। ওঁদের সরিয়ে দেওয়া দরকার, নইলে বিশ্রী একটা কান্ড হবে।

প্রাণধন বলল, ঠিক আছে, আপনি ভাববেন না। আগে আপনার দুই সিংগির গতি করব, তার পর আমাদের বিসর্জন। মা সরস্বতী না হয় ঘণ্টাখানিক ওয়েট করবেন। ওরে ভূতো বেণী মটরা হেবো, জলদি আমার সঙ্গে আয়। নিরঞ্জন সিং, লরিতে স্টার্ট দাও, আমরা এখনই আসছি।

চারজন অনুচরের সঙ্গে তাড়াতাড়ি শামিয়ানায় ঢুকে প্রাণধন বলল, ও সিংগি মশাইরা, শুনছেন? চেয়ার থেকে নেমে পড়ুন কাইন্ডলি, কেন লোক হাসাবেন?

কালাচাঁদ আর গৌরচাঁদ এক সঙ্গে বলল, খবরদার চেয়ার ছাড়বেন না।

প্রাণধন বলল, বটে? এই ভূতো বেণী মটরা হেবো, এগিয়ে আয়

তুরন্ত। সিংগি মশাইরা, যদি নিতান্তই না নামেন তবে দুজনেই চেয়ারের হাতল বেশ শক্ত করে ধরে টাইট হয়ে বসুন।

নিমেষের মধ্যে প্রাণধনের দল দুই সিংহ সমেত চেয়ারটা তুলে বাইরে এনে লরিতে চাপিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও উঠে পড়ে বলল, চালাও নিরঞ্জন সিং, সিধা আলীপুর চিড়িয়াখানা। লাউড স্পীকারটা তখনও মাটিতে পড়ে গর্জন করছে—অত কাছাকাছি বঁধু থাকা কি ভালো-ও-ও।

জুএর সামনে এসে লরি থামল। বটেশ্বর আর দামোদরকে খালাস করে প্রাণধন করজোড়ে বলল, কিছু মনে করবেন না মশাইরা। শুনেছি আপনারা বিশ্ববিখ্যাত লোক, শুধু দু বেটা গুন্ডার খপ্পরে পড়ে খেপে গিয়েছিলেন। সবই গেরোর ফের দাদা, কি করবেন বলুন। ঘাবড়াবেন না, আপনাদের ড্রাইভারদের বলা আছে, তারা আধ ঘণ্টার মধ্যে মোটর নিয়ে এসে পড়বে। ততক্ষণ আপনারা একটু গল্প-গুজব করুন, দুটো সুখ দুঃখের কথা ক'ন। আচ্ছা, আসি তবে, নমস্কার।

সিংহসমাগমের অতর্কিত পরিণাম দেখে প্রীতিসম্মিলনের সকলেই হতভম্ব হয়ে গেলেন। কালাচাঁদ আর গৌরচাঁদ বেগতিক দেখে সদলে সরে পড়ল। অতিথিরাও অনেকে বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু আয়োজন একবারে পণ্ড হল বলা যায় না। অতিথিদের মধ্যে অনুকূল চৌধুরী, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি চোদ্দ-পনরো জন মাথাঠান্ডা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁরা রয়ে গেলেন। সকলেই বেচারামবাবুকে আন্তরিক সমবেদনা জানালেন, বটেশ্বর-দামোদরের কেলেঙ্কারি আর কালাচাঁদ-গৌরচাঁদের গুন্ডামির নিন্দা করলেন, বাংলা

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য প্রকাশ করলেন, মাছের কচুরি, মাংসের চপ, চিঁড়ে ভাজা, কেক সন্দেশ চা প্রচুর খেলেন, তার পর গৃহস্বামীকে ধন্যবাদ এবং আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন।

১৮৭৮

কামরূপিণী

শীতকাল, বিকাল বেলা। শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেনে একটি দল গঙ্গার কাছে মাঠের উপর শতরঞ্চি পেতে বসেছেন। দলে আছেন—

প্রবীণ অধ্যাপক নিকুঞ্জ ঘোষ, তাঁর স্ত্রী ঊর্মিলা, আর মেয়ে ইলা, বয়স পনরো।

নিকুঞ্জর শালা নবীন অধ্যাপক বীরেন দত্তর স্ত্রী সুরুচি, আর তার ছেলে নুটু, বয়স ছয়।

বৃদ্ধ শীতল চৌধুরী। বীরেন দত্তর সঙ্গে এঁর কি একটা দূর সম্পর্ক আছে। ছোট বড় নির্বিশেষে সকলেই এঁকে শীতুমামা বলে ডাকে।

বীরেন দত্তর আসতে একটু দেরি হবে। তার নববিবাহিত বন্ধু মেজর সুকোমল গুপ্ত সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী আর শাশুড়ীর সঙ্গে আসাম থেকে কলকাতায় এসেছেন। বীরেন তাঁদের নিয়ে আসবে।

শীতল চৌধুরী বললেন, তোমাদের এ কি রকম পিকনিক? খাবার জিনিস কিছুই সঙ্গে আন নি, শুধু হাওয়া খেয়ে বাড়ি ফিরতে হবে নাকি?

সুরুচি বলল, ভয় নেই শীতুমামা। ওঁর সঙ্গে সবই এসে পড়বে, সস্ত্রীক সশাশুড়ীক মেজর সুকোমল গুপ্ত আর দেদার খাবার। গুপ্তর বউ আর শাশুড়ী নিজের হাতে সব খাবার তৈরি করে আনবেন। বউভাতের ভোজটা আমাদের পাওনা আছে, তা এখানেই খাওয়াবেন।

নুটু বলল, ও শীতুমামা, কাল যে গল্পটা বলছিলে তা তো শেষ হয় নি। খেতে অনেক দেরি হবে, ততক্ষণ গল্পটা বল না।

শীতুমামা বললেন, আচ্ছা বলছি শোন।—তার পর রাজা তো খুব সানাই ভেঁপু রামশিঙা ঢাক ঢোল জগঝম্প বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে সুয়োরানীকে বিয়ে করে রাজবাড়িতে নিয়ে এলেন। পঞ্চাশটা শাঁখ বেজে উঠল, রাজার মাসী পিসী মামীরা খুব জিব নেড়ে হুলুলুলু করলেন। বেচারী দুয়োরানী মনের দুঃখে তাঁর খোকাকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেলেন। এখন, সেই সুয়োরানীটা ছিল রাক্কুসী। সাত দিন যেতে না যেতে রাজার কাছে খবর এল—হাতিশালায় হাতি মরছে, ঘোড়াশালায় ঘোড়া মরছে, শুধু তাদের হাড় দাঁত আর ন্যাজ পড়ে আছে।

নুটু বলল, সুয়োরানী ওসব চিবুতে পারে না বুঝি?

নুটুর মা সুরুচি ধমক দিয়ে বলল, চুপ কর খোকা, ও ছাই গল্প শুনতে হবে না। শীতুমামা, আপনি এইসব বিদকুটে গল্প কেন বলেন? এতে ছোট ছেলেদের মনে একটা খারাপ ছাপ পড়ে।

নিকুঞ্জ ঘোষ হেসে বললেন, আরে না না। সব দেশেরই রূপকথায় একটু উৎকট ব্যাপার থাকে, তাতে ছোট ছেলেমেয়ের কোনও অনিষ্ট হয় না। তারা বেশ বোঝে যে সবই বানিয়ে বলা হচ্ছে! নয় রে নুটু?

নুটু বলল, হুঁ। আমিও গল্প বানাতে পারি।

সুরুচি বলল, যাই হ'ক, শীতুমামা আপনি ওসব বেয়াড়া মিথ্যে গল্প বলবেন না।

শীতুমামা বললেন, বেশ, মা-লক্ষ্মীর যখন আপত্তি আছে তখন বলব না। নুটু, তুই বরং তোর মায়ের কাছে রামায়ণের গল্প শুনিস, শূর্পণখা রাক্কুসীর কথা, খুব ভাল সত্যি গল্প। কিন্তু একটা কথা

তোমাদের জানা দরকার। রূপকথার সবটাই মিথ্যে এমন বলা যায় না। যা ঘটে তাই কতক কতক রটে।

নিকুঞ্জ-পত্নী ঊর্মিলা বললেন, আচ্ছা শীতুমামা, রাক্ষসী সুয়োরানী, পাতালপুরীর রাজকন্যা, সোনার কাঠি রুপোর কাঠি, কামরূপ-কামিখ্যের মায়াবিনী যারা ভেড়া বানিয়ে দেয়—এ সবে আপনি বিশ্বাস করেন?

—কিছু কিছু করি বইকি, বিশেষ করে ওই ভেড়া বানাবার কথা যা বললে।

নিকুঞ্জ-কন্যা ইলা বলল, ভেড়ার কথাটা খুলে বলুন না শীতুমামা।

—নাঃ থাক। নুটুর মায়ের যখন আপত্তি।

নিকুঞ্জ ঘোষ বললেন, লোকের কৌতূহলে খোঁচা দিয়ে চুপ করে থাকা ঠিক নয়, খোলসা করে বলে ফেলাই ভাল।

সুরুচি বলল, বেশ তো, শীতুমামা ভেড়ার গল্পটা খোলসা করেই বলুন, কিন্তু বেশী বেয়াড়া কথাগুলো বাদ দেবেন।

শীতুমামা বললেন, নাঃ থাক গে। বরং একটু ভগবৎপ্রসঙ্গ হ'ক। ইলা ভাই, তুমি একটি রবীন্দ্রসংগীত গাও, সেই 'মাথা নত করে দাও' গানটি।

সুরুচি বলল, অত মান ভাল নয় শীতুমামা। আমি মাপ চাচ্ছি, আপনি ভেড়ার গল্প বলুন।

নুটু বলল, না, আগে সেই রাক্ষুসী সুয়োরানীর গল্প হবে।

সুরুচি বলল, তুই থাম খোকা। রাক্ষুসীর চাইতে ভেড়াওয়ালী ভাল। বলুন শীতুমামা।

শীতল চৌধুরী বলতে লাগলেন।—

পঁচিশ বৎসর আগেকার কথা। বলভদ্র মর্দরাজকে তোমরা চিনবে না, তার বাপ রামভদ্র মর্দরাজ বালেশ্বর জেলার একজন বড় জমিদার ছিলেন, রাজা বললেই হয়। তাঁর এস্টেটে আমি তখন কাজ করতুম। বলভদ্রর বয়স ত্রিশের নীচে, সুপুরুষ, মেজাজ ভাল, শিকারের খুব শখ। একদিন সে আমাকে বলল, ও শীতলবাবু, কেবলই সেরেস্তার কাজ নিয়ে থাকলে তোমার মাথা বিগড়ে যাবে। বাবাকে বলে তোমার বিশ দিনের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে কিমাপুর চল, উত্তরপূর্ব আসামে, খাসা জায়গা, দেদার শিকার। সেখানে আঠারো-শিঙা হরিণ পাওয়া যায়, আকারে খুব বড় নয়, কিন্তু শিঙ দুটো অতি অদ্ভুত, প্রত্যেকটার নটা ফেঁকড়া।

সব খরচ বলভদ্র যোগাবে, আমার কাজ হবে শুধু মোসাহেবি, সুতরাং রাজী হলুম। কিমাপুর জায়গাটা একটু দুর্গম, ব্রহ্মপুত্রের ওপারে ভুটান রাজ্যের লাগাও, তবে কামরূপ জেলাতেই পড়ে। পথ ভাল নয়, কোনও রকমে মোটর চলে। শিকারী বলে বলভদ্রর খুব খ্যাতি ছিল, সহজেই আসাম গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে সব রকম দরকারী পারমিট পেয়ে গেল। একটা বড় হুডসন মোটর গাড়ি, অনেক খাবার জিনিস, ড্রাইভার, আর একজন চাকর নিয়ে আমরা কিমাপুর ডাক-বাংলায় উঠলুম। রোজই শিকারের চেষ্টা হত, নানা রকম জানোয়ারও পাওয়া যেত, কিন্তু আঠারো-শিঙা হরিণের দেখা নেই। ওখানকার লোকরা বলল, আরও উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যাবে। খানিক দূর পর্যন্ত কোনও রকমে মোটর চলবে, তার পর হেঁটে যেতে হবে।

সকাল আটটার সময় আমরা যাত্রা করলুম। গাড়িতে বলভদ্র, আমি, ড্রাইভার কিরপান সিং, আর তার পাশে একজন ভুটিয়া, সে পথ দেখাবে। রাস্তা অতি খারাপ, দু বার টায়ার পংচার হল, তিন মাইল যেতেই বেলা এগারোটা বাজল। গরম বেশ, খিদেও খুব পেয়েছে।

আমরা বিশ্রামের উপযুক্ত জায়গা খুঁজছি, এমন সময় দেখতে পেলুম গাছের আড়ালে একটি সুন্দর ছোট বাংলা। আমরা একটু এগিয়ে যেতেই সেই বাংলা থেকে একটি অপূর্ব সুন্দরী বেরিয়ে এলেন। নিখুঁত গড়ন, খুব ফরসা, তবে নাক একটু খাঁদা, আর চোখ পটল-চেরা নয়, লংকা-চেরা বলা যেতে পারে। আমরা নমস্কার করে নিজেদের পরিচয় দিলুম। সুন্দরী জানালেন, তাঁর নাম মায়াবতী কুরুঞ্জি, এখন একলাই আছেন, তাঁর সঙ্গিনী মাসী-মা চাকরকে নিয়ে কিমাপুরের হাটে গেছেন। মায়াবতী খাঁটী বাংলাতেই কথা বললেন, তবে উচ্চারণে একটু আসামী টান টের পাওয়া গেল। তাঁর সাদর আহ্বানে কৃতার্থ হয়ে আমরা আতিথ্য স্বীকার করলুম।

বলভদ্র মর্দরাজের ভঙ্গী দেখে বোঝা গেল সে প্রথম দর্শনেই প্রচণ্ড প্রেমে পড়েছে, তার কথার সুরে গদ্‌গদ ভাব ফুটে উঠেছে। আমাদের ভুটিয়া গাইড লাদেন গাম্পা চুপি চুপি আমাকে বলল, ওই মেমসাহেবটা ভাল নয়, পালিয়ে চলুন এখান থেকে। কিন্তু তার কথা কে গ্রাহ্য করে। বলভদ্র প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে আর আমিও মুগ্ধ হয়ে গেছি।

মায়াবতী আমাদের খুব সৎকার করলেন। বললেন, আঠারো-শিঙা হরিণের সীজন এখন নয়, তারা শীতকালে পাহাড় থেকে নেমে আসে। মিস্টার মর্দরাজ আর মিস্টার চৌধুরী যদি দু মাস পরে আসেন তখন নিশ্চয় শিকার মিলবে। আমরা বহু ধন্যবাদ এবং আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলুম।

পথে গোটাকতক পাখি মেরে আমরা কিমাপুর ডাকবাংলায় ফিরে এলুম। তার পর দিন বলভদ্র আবার মায়াবতীর কাছে গেল, শরীরটা একটু খারাপ হওয়ায় আমি বাংলাতেই রইলুম। অনেক বেলায় ফিরে এসে বলভদ্র বলল, শোন শীতলবাবু, আমি ওই মিস মায়াবতীকে বিয়ে করব, পনরো দিন পরে ওকে নিয়ে কলকাতায় যাব। তুমি কালই চলে

যাও, বালিগঞ্জে একটা ভাল বাড়ি ঠিক করে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। আমি অনেক বোঝালুম, অজ্ঞাতকুলশীলাকে হঠাৎ বিয়ে করা উচিত নয়, তার বাবাও তা পছন্দ করবেন না। কিন্তু বলভদ্র কোনও কথা শুনল না, অগত্যা আমি পরদিনই কলকাতায় রওনা হলুম।

পনরো দিন পরে বলভদ্রের ড্রাইভার কিরপান সিং আমার কাছে এসে খবর দিল—বলভদ্র হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছে, কোথায় গেছে কেউ জানে না, মেমসাহেব মায়াবতীও বলতে পারলেন না। জেরা করে জানলুম, চার দিন আগে গাড়িটা বিগড়ে যাওয়ায় বলভদ্র সকালবেলা মায়াবতীর কাছে হেঁটে গিয়েছিল। মনিব ফিরে এলেন না দেখে পরদিন কিরপান সিং খোঁজ নিতে গেল। গিয়ে দেখল, সেখানে শুধু মায়াবতী আর তাঁর বুড়ী মাসী আছেন। তাঁরা বললেন, বলভদ্র গতকাল সকালে এসেছিলেন বটে, কিন্তু এখান থেকে কোথায় গেছেন তা তাঁরা জানেন না। কিরপান সিং আরও দেখল, একটি বাদামী রঙের নধর ভেড়া বারান্দার খুঁটির সঙ্গে বাঁধা আছে, একটা ধামা থেকে ভিজে ছোলা খাচ্ছে।

সুরুচি বলল, শীতুমামা, আপনি কি বলতে চান সেই ভেড়াটাই বলভদ্র মর্দরাজ?

—আমি কিছুই বলতে চাই না। যা শুনেছি তাই হুবহু জানালুম, বিশ্বাস করা না করা তোমাদের মর্জি।

নুটু বলল, শীতুমামা, ভেড়াটা ছোলা খাচ্ছিল কেন? সেখানে বুঝি ঘাস নেই?

ইলা বলল, বুঝলি না খোকা, গ্রাম-ফেড মটন তৈরি হচ্ছিল। উঃ আপনি খুব বেঁচে গেছেন শীতুমামা।

এই সময়ে সুরুচির স্বামী বীরেন দত্ত এবং তার সঙ্গে দুটি মহিলা এসে পৌঁছুলেন। খাবারের ঝুড়ি নিয়ে দুজন অনুচরও

এল। মহিলাদের একজনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, আর একজনের বাইশ-তেইশ। দুজনেই অসাধারণ সুন্দরী, যদিও চোখ আর নাক একটু মঙ্গোলীয় ছাঁদের।

বীরেন দত্ত পরিচয় করিয়ে দিল—ইনি হচ্ছেন সুকোমল গুপ্তর শাশুড়ী ঠাকরুন মিসিস মায়াবতী মর্দরাজ, আর ইনি সুকোমলের স্ত্রী মিসিস মোহিনী গুপ্ত। আমাদের আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে, এঁরা অনেক রকম খাবার তৈরি করলেন কিনা।

ইলা ফিসফিস করে বলল, শীতুমামা, এই মায়াবতীই আপনার সেই তিনি নাকি?

শীতুমামা বললেন, চুপ চুপ।

নিকুঞ্জ ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন, কই, মেজর গুপ্ত এলেন না?

মধুর কণ্ঠে মোহিনী গুপ্ত বললেন, সুকোমল? তার কথা আর বলবেন না, পুওর ফেলো। কোথায় উধাও হয়েছে কিছুই জানি না।

আঁতকে উঠে ইলা ফিসফিস করে বলল, কি সর্বনাশ!

মায়াবতী বললেন, মিলিটারী সার্ভিসের মতন ওঁচা চাকরি আর নেই, হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পেয়ে কিছু না জানিয়েই চলে গেছে। আপনারা খেতে বসে যান, নয়তো সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। মোহিনী আর আমি পরিবেশন করছি।

বীরেন দত্ত বলল, শীতুমামা, সব জিনিস নির্ভয়ে খেতে পারেন। আপনি মন্ত্র নিয়েছেন, নিষিদ্ধ মাংস এখন আর খান না, তাই এঁরা চিকেন বাদ দিয়েছেন। কাটলেট ফ্রাই পাই চপ সিককাবাব সবই পবিত্র ভেড়ার মাংসে তৈরী, এঁদের স্পেশিয়ালিটিই হল ভেড়া। হেঁ হেঁ হেঁ, এঁরা কামরূপ-কামিখ্যের মহিলা কিনা।

ইলা বলল, ওরে মা রে!

নিকুঞ্জ ঘোষ বললেন, কই, আপনারা কিছু নিলেন না?

মায়াবতী স্মিতমুখে বললেন, আমরা একটু আগেই খেয়েছি।

শিউরে উঠে ইলা বলল, ইঁ হিঁ হিঁ, ওরে বাবা রে!

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে সুরুচি বলল, আমার গা গুলুচ্ছে, গঙ্গার ধারে বসি গিয়ে।

ঊর্মিলা বললেন, আমারও কেমন কেমন বোধ হচ্ছে, আমিও যাই।

ইলাও তার মায়ের সঙ্গে গেল।

বীরেন ব্যস্ত হয়ে পিছনে পিছনে গিয়ে বলল, এঁরা ছ বোতল সোডাও এনেছেন, একটু খাও, নশিয়া কেটে যাবে।

সুরুচি বলল, ওআক থু! রাক্ষুসীদের জলস্পর্শ করব না।

বাড়ি ফিরে এসে সব কথা শুনে বীরেন বলল, ছি ছি, কি কেলেঙ্কারি করলে তোমরা! এই জন্যেই শাস্ত্রে বলেছে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী। শীতুমামার গাঁজাখুরী গল্পটা বিশ্বাস করলে! উনি নিজে তো গাণ্ডে পিণ্ডে খেয়েছেন।

কাশীনাথের জন্মান্তর

প্রায় দেড় শ বৎসর আগেকার কথা। তখন কলকাতার বাঙালী হিন্দুসমাজে নানারকম পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে কিন্তু তার কোনও লক্ষণ রাঘবপুর গ্রামে দেখা দেয় নি। কাশীনাথ সার্বভৌম সেই গ্রামের সমাজপতি, দিগ্‌গজ পণ্ডিত, যেমন তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান তেমনি বিষয়বুদ্ধি। তাঁর সন্তানরা কলকাতা হুগলি বর্ধমান কৃষ্ণনগর মুরশিদাবাদ প্রভৃতি নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তিনি নিজে তাঁর গ্রামেই থাকেন, জমিদারি দেখেন, তেজারতি আর দেবসেবা করেন, একটি চতুষ্পাঠীরও ব্যয় নির্বাহ করেন।

একদিন শেষরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর ইষ্টদেবী কালীমাতা আবির্ভূত হয়ে বলছেন, বৎস কাশীনাথ, তোমার বয়স শত বর্ষ অতিক্রম করেছে, তুমি সুদীর্ঘকাল ইহলোকের সুখদুঃখ ভোগ করেছ। আর কেন, এখন দেহরক্ষা কর।

কাশীনাথ বললেন, মা কৈবল্যদায়িনী, এখন তো মরতে পারব না। আমার জাজ্বল্যমান সংসার, চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী এখনও বেঁচে আছেন। আঠারোটি পুত্রকন্যা, এক শ পঁচিশটি পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী। প্রপৌত্র প্রদৌহিত্র প্রভৃতি বোধ হয় হাজার খানিক জন্মেছিল, তাদের অনেকে মরেছে কিন্তু এখনও প্রচুর জীবিত আছে। তা ছাড়া বিস্তর শিষ্য আমার চতুষ্পাঠীতে পড়ে, আমি তাদের পালন ও অধ্যাপনা করি। এই সব স্নেহভাজনদের ত্যাগ করা অতীব কষ্টকর। তোমার জন্য একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণের সংকল্প করেছি, তাও উদ্‌যাপন করতে হবে। কলকাতার কিরিস্তানী অনাচার যদি এই গ্রামে প্রবেশ করে

তবে আমাকেই তা রোধ করতে হবে। আমার ছেলেদের দিয়ে কিছু হবে না, তারা স্বার্থপর, নিজের ধান্দা নিয়েই ব্যস্ত। বয়স বেশী হলেও আমার শরীর এখনও শক্ত আছে। অতএব কৃপা করে আরও দশটি বৎসর আমাকে বাঁচতে দাও।

কালীমাতা, ভ্রূকুটি করে অন্তর্হিত হলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কাশীনাথ সার্বভৌমের চতুর্থ পক্ষের পত্নী রাসেশ্বরী বললেন, আজ যে তোমার তিনটি প্রপৌত্রপুত্র আর পাঁচটি প্রদৌহিত্রপুত্রের অন্নপ্রাশন, তার হুঁশ আছে? তুমি চট করে স্নান আহ্নিক সেরে এস, তোমাকেই তো হোমযাগ করতে হবে।

গঙ্গায় স্নান করে এসে কাতরকণ্ঠে কাশীনাথ বললেন, সর্বনাশ হয়েছে গিন্নী, কালসর্প আমাকে দংশন করেছে, আমার মৃত্যু আসন্ন। মা করালবদনী, এ কি করলে, হায় হায়, সংকল্পিত কর্ম সমাপ্ত না হতেই আমাকে পরলোকে পাঠাচ্ছ!

শাস্ত্রে বলে, যার যেমন ভাবনা তার তেমনি সিদ্ধিলাভ হয়। কাশীনাথ যদি শ্রীরামপুরের পাদরীদের কবলে পড়ে খ্রীষ্টান হতেন তবে মৃত্যুর পর শেষবিচারের প্রতীক্ষায় তাঁকে সুদীর্ঘ কাল জড়ীভূত হয়ে থাকতে হত, সরীসৃপাদি যেমন শীতকালে থাকে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, সেজন্য তাঁর পারলৌকিক পরিণাম অবিলম্বে সংঘটিত হল।

মৃত্যুর পরেই কাশীনাথ উপলব্ধি করলেন, তিনি সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে শূন্যে অবস্থান করছেন, তাঁর প্রাণহীন দেহ অঙ্গনে তুলসী-মঞ্চের সম্মুখে পড়ে আছে। তাঁর পত্নী আর আত্মীয়বর্গ চারিদিকে বিলাপ করছেন, প্রতিবেশীরা বলছেন, ওঃ, একটা ইন্দ্রপাত হল!

ক্ষণকাল পরেই তিনি প্রচণ্ড বেগে ব্যোমমার্গে দক্ষিণ দিকে বাহিত হয়ে যমলোকে উপনীত হলেন।

যম বললেন, এস হে কাশীনাথ। তোমার সুকৃতি-দুষ্কৃতির বিচার এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি, সংক্ষেপে বলছি শোন। পুণ্যকর্মের তুলনায় তোমার পাপকর্ম অল্প। রামগতি ভট্টাচার্যের জমির কিয়দংশ তুমি অন্যায় ভাবে দখল করেছিলে, তিন বার আদালতে মিথ্যা হলফ করেছিলে, প্রথম ও মধ্য বয়সে বন্ধুপত্নী ও বধূস্থানীয় কয়েক জনের প্রতি কুদৃষ্টিপাত করেছিলে, মূষিকের ন্যায় অজস্র সন্তান উৎপাদন করেছিলে, অন্তিম কাল পর্যন্ত বিষয়চিন্তায় মগ্ন ছিলে। এ ছাড়া আর যা করেছ সবই সৎকার্য। নিয়মিত দুর্গোৎসবাদি করেছ, গঙ্গাস্নান তীর্থভ্রমণ বারব্রতাদি এবং ব্রাহ্মণের যাবতীয় কর্তব্য পালন করেছ, কদাপি অখাদ্য ভোজন কর নি। দুষ্কৃতির জন্য তুমি পঞ্চাশ বৎসর নরকবাস করবে, তার পর পুণ্যকর্মের ফল স্বরূপ এক শত বৎসর স্বর্গবাস করবে। আচ্ছা, এখন যাও, কর্মফল ভোগ কর গিয়ে।

নির্দিষ্ট কাল নরকভোগ আর স্বর্গভোগের অন্তে কাশীনাথ পুনর্বার যমসকাশে আহূত হলেন। যম বললেন, ওহে কাশীনাথ, তোমার প্রাক্তন কর্মের ফলভোগ সমাপ্ত হয়েছে, এখন তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে। বিধাতা তোমার উপর প্রসন্ন, তুমি অভীষ্ট কুলে জন্মগ্রহণ করতে পারবে। বল, কি প্রকার জন্ম চাও, ধনী বণিকের বংশধর হয়ে, না দরিদ্র জ্ঞানী ধর্মাত্মার পুত্র রূপে, না শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে?

কাশীনাথ উত্তর দিলেন, ধর্মরাজ, মৃত্যুকাল আমার অনেক কামনা

অতৃপ্ত ছিল। দয়া করে এই ব্যবস্থা করুন যাতে আমার বর্তমান বংশধরের গৃহেই প্রত্যাবর্তন করতে পারি। আমার প্রপৌত্রের পুত্র শ্রীমান ভবানীচরণ আমার অতিশয় স্নেহভাজন ছিল, তারই সন্তান করে আমাকে ধরাধামে পাঠান।

যম বললেন, কি বলছ হে কাশীনাথ! জীবিত কালেই তুমি অধস্তন পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত দেখেছিলে। তোমার মৃত্যুর পর দেড় শ বৎসর কেটে গেছে, তাতে আরও ছ পুরুষ হয়েছে। এখন যে বংশধর সে তোমার সপিণ্ডও নয়, তার সঙ্গে তোমার কতটুকু সম্পর্ক? তার পুত্র হয়ে জন্মালে তোমার কি লাভ হবে? আরও তো ভাল ভাল বংশ আছে।

কাশীনাথ বললেন, প্রভু, দয়া করে সেই অধস্তন একাদশসংখ্যক বংশধরের গৃহেই আমাকে পাঠিয়ে দিন। ব্যবধান যতই থাকুক, সে আমার তথা শ্রীমান ভবানীচরণের সন্তান, অতীব স্নেহের পাত্র। তাকে দেখবার জন্য আমি উৎকণ্ঠ হয়ে আছি।

—তুমি তাকে চিনবে কি করে? তোমার বর্তমান স্মৃতি তো থাকবে না, জ্ঞানহীন ক্ষুদ্র শিশু রূপে প্রসূত হয়ে তুমি ক্রমে ক্রমে বড় হবে, জ্ঞানার্জনও করবে, কিন্তু বিগত কালের সঙ্গে তোমার নবজীবনের যোগ থাকবে না।

—প্রভু, আমার প্রার্থনাটি অবধান করুন। নারীগর্ভে ন মাস দশ দিন বাস করার পর শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হতে আমি চাই না। জ্ঞানবান জাতিস্মর করেই আমাকে পাঠিয়ে দিন।

—মরবার সময় তোমার বয়স এক শ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হয়েছিল। সেই বয়স নিয়েই জন্মাতে চাও নাকি?

—আজ্ঞে না। জরাজীর্ণ স্থবির হয়ে যদি পৃথিবীতে যাই তবে

নবজন্ম ক দিন ভোগ করব? আমাকে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের যুবা করে পাঠিয়ে দিন।

—তোমার আকাঙ্ক্ষা অতি অদ্ভুত। গর্ভবাস করবে না, যুবা রূপে নবজন্ম লাভ করবে, পূর্বস্মৃতি বিদ্যমান থাকবে, বর্তমান বংশধরের গৃহে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হবে। এই তো তুমি চাও?

—আজ্ঞে হাঁ।

—আচ্ছা, তাই হবে। দেখাই যাক না এর ফল কি হয়। তোমার গোত্র কি?

—ভরদ্বাজ।

যমরাজ মুহূর্তকাল ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন, তার পর বললেন, ধরাধামে অনেক সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে। তুমি যদি স্বাভাবিক নিয়মে শিশু রূপে ভূমিষ্ঠ হতে তবে ক্রমে ক্রমে বর্তমান অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যেতে। কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব সমাজে হঠাৎ অবতরণের ফলে সংকটে পড়বে। তোমার অসুবিধা যাতে অত্যধিক না হয় তার জন্য আমি যথাসম্ভব ব্যবস্থা করছি।

যম তাঁর এক অনুচরকে বললেন, আজ দ্বিপ্রহর রাত্রিতে এই জীবাত্মা ত্রিশ বৎসরের যুবা রূপে ধরাধামে ফিরে যাবে। একে পশ্চিম বঙ্গের আধুনিক ভাষা শিখিয়ে দাও, সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ অপভ্রষ্ট ইংরেজী আর হিন্দীও। বর্তমান কালের উপযুক্ত পরিচ্ছদ, নিতান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তু, এবং প্রচুর অর্থও একে দেবে। একটি নিষ্ক্রান্তি বটিকাও দেবে। তার পর কলিকাতা নগরীতে নিয়ে গিয়ে শ্রীমধুসূদন রোডে তিন নম্বর বাড়ির ফটকের সামনে একে সুপ্ত অবস্থায় রেখে দেবে। ওহে কাশীনাথ, তোমার বংশধর চক্রধর মুখুজ্যের কাছে তোমাকে পাঠাচ্ছি। তোমার পূর্বনামই বজায় থাকবে। যদি দেখ যে বর্তমান সমাজব্যবস্থা তোমার পক্ষে কষ্টকর, কিছুতেই

তুমি সইতে পারছ না, তবে নিষ্কান্তি বটিকাটি খেয়ো। তা হলে তৎক্ষণাৎ যমলোকে ফিরে আসবে এবং অবিলম্বে পুনর্বার সনাতন রীতিতে জন্মগ্রহণ করবে।

চক্রধর মুখুজ্যে ধনী লোক, বাস্তুবিবর্ধন করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তিন নম্বর শ্রীমধুসূদন রোডে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি। সকালে আটটার আগে তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠেন না, কিন্তু আজ ভোর বেলায় তাঁর স্ত্রী সুরূপা ঠেলা দিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন। চক্রধর জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

—নীচে গোলমাল হচ্ছে শুনতে পাচ্ছ না? বারান্দায় দাঁড়িয়ে খোঁজ নাও কি হয়েছে। আমার বাপু ভয় করছে।

চক্রধর বারান্দা থেকে দেখলেন গেটের সামনে অনেক লোক জমা হয়ে কলরব করছে। প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে লালবাহাদুর?

দারোয়ান লালবাহাদুর বলল, কে একজন বাবু ফটকের সামনে রাস্তার উপর পড়ে আছে, বেঁচে আছে কি মরে গেছে বোঝা যাচ্ছে না।

নেমে এসে চক্রধর দেখলেন, তাঁর বাড়ির ফটকের ঠিক বাইরে একটা চামড়ার ব্যাগ মাথায় দিয়ে আগন্তুক বেহুঁশ হয়ে শুয়ে আছে। বার কতক জোরে ঠেলা দিতেই লোকটি মিটমিট করে তাকাল, তার পর আস্তে আস্তে উঠে হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলল, তারা ব্রহ্মময়ী করালবদনী, কোথায় আনলে মা?

চক্রধর বললেন, কে হে তুমি? এখন নেশা ছুটেছে? কি খেয়েছিলে, মদ না চণ্ডু?

—আমি শ্রীকাশীনাথ মুখোপাধ্যায় সার্বভৌম, আবার এসে

পেঁৗছেছি। তুমিই চক্রধর? শ্রীমান ভবানীচরণের বংশধর? আহা, কত বড়টি হয়েছ! ঘরে চল বাবাজী, সব কথা বলছি।

কাশীনাথের আত্মকথা শুনে চক্রধর স্থির করলেন, লোকটা নেশাখোর নয়, মিথ্যাবাদী জুয়াচোরও নয়, কিন্তু এর মাথা খারাপ। প্রশ্ন করলেন, তোমার ওই ব্যাগে কি আছে?

—তা তো জানি না, তুমিই খুলে দেখ। এই যে, আমার পইতেতে চাবি বাঁধা রয়েছে, খুলে নাও।

চক্রধর ব্যাগ খুললেন। গোটাকতক ধুতি গেঞ্জি পঞ্জাবি, একটা এণ্ডির চাদর, একজোড়া চটি, একটা গামছা, আরশি চিরুনি ইত্যাদি। নীচে একটা পোর্টফোলিও। সেটা খুলে চক্রধর আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, প্রায় পাঁচ লাখ টাকার গভর্নমেণ্ট কাগজ এবং ভাল ভাল শেয়ার, নগদ দু হাজার টাকার নোট আর দশ টাকার আধুলি সিকি আনি ইত্যাদি।

—সব তোমারই নামে দেখছি। কি করে পেলে?

—কিছুই জানি না বাবাজী, সবই জগদম্বার লীলা আর যমরাজের ব্যবস্থা।

চক্রধর অনেক ক্ষণ ভাবলেন। লোকটি পাগল হলেও গুছিয়ে কথা বলে। একে হাতছাড়া করা চলবে না, বাড়িতেই রাখতে হবে, চিকিৎসাও করাতে হবে। বয়স তো বেশী নয়, বড় জোর ত্রিশ। তাঁর একমাত্র মেয়ের বিবাহ হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর ভাইঝি চন্দনা তো রয়েছে। এই কাশীনাথের সঙ্গে বিয়ে দিলে সেই বাপ-মা-মরা মেয়েটার একটা চমৎকার গতি হয়ে যায়। পাঁচ লাখ টাকার ইনভেস্টমেণ্ট কি সোজা কথা! লোকটা যদি তিন বৎসর আগে আসত তবে চক্রধর নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতেন।

চক্রধর বললেন, শোন হে কাশীনাথ। তুমি আমার পূর্বপুরুষ

হলেও আপাতত আমার চাইতে অনেক ছোট, তোমার বয়স বোধ হয় ত্রিশ হবে, আর আমার হল গিয়ে ষাট। তোমার ইতিহাস আমি জানলুম, কিন্তু আর কাকেও ব'লো না, লোকে তোমাকে পাগল ভাববে। তুমি আমার জ্ঞাতি, ছেলেবেলায় তোমাদের পাড়াগাঁ থেকে এক সন্ন্যাসীর সংগে পালিয়েছিলে, এখন সন্ন্যাসে অরুচি হওয়ায় আমার আশ্রয়ে এসেছ, এই তোমার পরিচয়। তুমি আমাকে বলবে কাকাবাবু, আমি তোমাকে বলব কাশী বাবাজী। তোমার সম্পত্তির কথা খবরদার কাকেও বলবে না, বুঝলে?

কাশীনাথ বললেন, হাঁ, বুঝেছি। কিন্তু তোমার বাড়িতে আমি থাকব কি করে? তুমি তো দেখছি ম্লেচ্ছ হয়ে গেছ। পেঁয়াজের গন্ধ পাচ্ছি, পাশের জমিতে মুরগি চরছে। একটি প্রৌঢ়াকে দেখলুম, চটি জুতো পরে চটাং চটাং করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল, ঘোমটা নেই, প্যাঁটপ্যাঁট করে আমার দিকে চাইল।

—উনি তোমার কাকীমা।

—ও, তা বেশ। কিন্তু স্ত্রীলোক জুতো পরে কেন? ঘোর কলি।

—ঠিক বলছ বাবাজী, ঘোর কলি। এই কলিযুগের সংগেই তোমাকে মানিয়ে চলতে হবে।

—তুমি বোধ হয় মুসলমান বাবুর্চীর রান্না খাও? তা আমি মরে গেলেও খেতে পারব না।

—না না, বাবুর্চী আছে বটে, কিন্তু মুসলমান নয়, হরিজন, জাতে চামার।

—রাধামাধব! আমি স্বপাকে খাব, আজ শুধু ফলার। আমার থাকবার আলাদা ব্যবস্থা করে দাও।

—বেশ তো, আমার বাড়ির নীচের তলায় পূব দিকের অংশে তুমি থাকবে, একবারে আলাদা আর নিরিবিলি।

চক্রধর ডাকলেন, চন্দনা, ও চন্দনা।

একটি মেয়ে ঘরে এল। চক্রধর বললেন, এটি আমার ভাইঝি। প্রণাম কর্ রে, ইনি তোর কাশী দাদা, দূর সম্পর্কে আমার ভাইপো।

চন্দনা প্রণাম করে চলে গেল। কাশীনাথ বললেন, তোমাদের কান্ড কিছুই বুঝতে পারছি না। মেয়েটার মাথায় সিঁদুর নেই কেন? কপাল পুড়েছে নাকি?

চক্রধর বললেন, না না, ওর বিয়েই হয় নি। খুব ভাল মেয়ে, বি. এ. পাস করেছে।

—দুর্গা দুর্গা! এত বড় ধাড়ী মেয়ের বিবাহ হয় নি? বিবি বানাচ্ছ দেখছি।

—আচ্ছা কাশীনাথ, তোমার বিবাহের মতলব আছে তো?

—আছে বইকি। একজন ভাল ঘটক লাগাও।

—আমার ভাইঝি এই চন্দনাকে বিয়ে কর না?

—তুমি উন্মাদ হলে নাকি চক্রধর? এক গোত্রে বিবাহ হবে কি করে? তা ছাড়া ও রকম বেয়াড়া স্ত্রী আমার পোষাবে না। সদ্‌বংশের লজ্জাবতী নিষ্ঠাবতী মেয়ে চাই। বিদ্যার দরকার নেই, রান্না আর ঘরকন্নার সব কাজ জানবে, বারব্রত পালন করবে, তোমার গিন্নী আর ভাইঝির মতন ধিঙগী হলে চলবে না।

—মুশকিলে ফেললে কাশীনাথ। তুমি যেরকম পাত্রী চাও তেমন মেয়ে ভদ্র ঘরে আজকাল লোপ পেয়েছে। আচ্ছা, যতটা সম্ভব তোমার পছন্দসই পাত্রীর জন্যে আমি চেষ্টা করব। এখন তুমি স্নান আর সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে আহারাদি কর।

চক্রধর মুখুজ্যে ভাবতে লাগলেন। লোকটা পাগল, কিন্তু কথা-বার্তা অসংলগ্ন নয়, সেকেলে মতিগতি হলেও বুদ্ধিমান বলা চলে। আশ্চর্য ব্যাপার, কাশীনাথ অত টাকা পেল কোথা থেকে? যাই হক, ওকে আটকে রাখতে হবে, সম্পত্তি যাতে আমার কাছেই গচ্ছিত রাখে তার ব্যবস্থা করতে হবে। চন্দনার সঙ্গে বিয়ে হলে খাসা হত, একবারে আমার হাতের মুঠোয় এসে পড়ত। ওর পছন্দমত পাত্রীই বা পাই কোথায়? সেকেলে নিষ্ঠাবতী মেয়ে হবে, পাগল স্বামীকে সামলাবে, আবার আমার বশে চলবে। হঠাৎ চক্রধরের মাথায় একটি বুদ্ধি এল। আচ্ছা, গয়েশ্বরীর সঙ্গে বিয়ে দিলে হয় না? তার তো খুব নিষ্ঠা আর আচার-বিচার, বুদ্ধি খুব, আমাকেও খাতির করে, সব বিষয়ে আমার মত নেয়। টাকার লোভে কাশীনাথকে বিয়ে করতে হয়তো রাজী হবে। কিন্তু বয়সের তফাতটা যে বড্ড বেশী।

গয়েশ্বরী সম্পর্কে চক্রধরের ভাগনী, জেঠতুতো বোনের মেয়ে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হলেও এখনও তিনি কুমারী। বাপ মা অল্প বয়সে মারা গেলে চক্রধরই অভিভাবক হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে ভাগনীর তত্ত্বাবধান বেশী দিন করতে হয় নি। গয়েশ্বরী অসাধারণ মহিলা, অল্প লেখাপড়া আর নানা রকম শিল্পকর্ম শিখেই তিনি স্বাবলম্বিনী হলেন। তাঁর নারীবস্ত্রশালা খুব লাভের ব্যবসা। পাঁচ জন উদ্‌বাস্তু মেয়ে আর দু জন দরজী গয়েশ্বরীর দোকানে কাজ করে, তিনটে সেলাইএর কল চলে, খদ্দেরের খুব ভিড়। চক্রধর অনেক বার ভাগনীর বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গয়েশ্বরী বলেছেন, ও সব হবে না, আমি কত কষ্ট করে ব্যবসাটি খাড়া করেছি, আর এখন একটা উটকো মিনসে এসে কর্তামি করবে তা আমি সইব না। চক্রধর স্থির করলেন, খুব সাবধানে কথাটা পাত্র আর পাত্রীর কাছে পাড়তে হবে।

দৈবক্রমে চার দিন পরেই কাশীনাথ আর গয়েশ্বরীর একটা সংঘর্ষ হয়ে গেল।

চক্রধরের বাড়ির একতলায় পূর্বদিকের অংশে কাশীনাথ স্বতন্ত্র হয়ে বাস করতে লাগলেন। তিনি স্বপাকে খান, চক্রধরের একজন পুরনো চাকর তাঁর ফরমাশ খাটে। একদিন সকালবেলা প্রাতঃকৃত্য সেরে কাশীনাথ গড়িয়াহাট মার্কেটে বাজার করতে গেছেন। জামাই-ষষ্ঠীর জন্যে সেদিন বাজারে খুব ভিড়। কাশীনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ভাবছিলেন, এ যে ঘোর কলি, বারো আনা সের বেগুন! সব জিনিসই অগ্নিমূল্য, দেশে মন্বন্তর হয়েছে নাকি? কাশীনাথ দুটি কাঁচকলা কিনবেন বলে ভিড়ের মধ্যে সাবধানে অগ্রসর হচ্ছিলেন এমন সময় অকস্মাৎ থপাস করে গয়েশ্বরীর সঙ্গে তাঁর কলিশন হল।

কাশীনাথের অপরাধ নেই। তিনি রোগা বেঁটে মানুষ, পিছনের ভিড়ের ঠেলা সামলাতে না পেরে সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় গয়েশ্বরী উলটো দিক থেকে আসছিলেন। তিনি স্থূলকায়া, সুতরাং তাঁর দেহেই পতনোম্মুখ কাশীনাথের ধাক্কা প্রতিহত হল। গয়েশ্বরী পড়ে গেলেন না, অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন, আ মরণ ছোঁড়া, নেশা করেছিস নাকি? ভদ্রলোকের মেয়ের গায়ে ঢলে পড়িস এতদূর আস্পর্ধা!

কাশীনাথ বললেন, ক্ষমা করবেন ঠাকরুন, ভিড়ের চাপে এমন হল, আমি ইচ্ছে করে অপরাধ করি নি।

গয়েশ্বরী বললেন, এক শ বার অপরাধ করেছিস; হতভাগা বেহায়া বজ্জাত!

এক দল লোক গয়েশ্বরীর পক্ষ নিয়ে এবং আর এক দল কাশী-

নাথের হয়ে তুমুল ঝগড়া আরম্ভ করল। গয়েশ্বরীকে অনেকেই চেনে। একজন টিকিধারী পুরুত ঠাকুর বললেন, ও গয়া দিদি, ব্যাপারটি তো সোজা নয়, তোমাকে প্রায়শ্চিত্তির করতে হবে।

চার-পাঁচ জন চিৎকার করে বলতে লাগল, নিশ্চয় নিশ্চয়। তুমি লোকটা কে হে, পাড়া-গাঁ থেকে এসেছ বুঝি! ধাক্কা লাগাবার আর মানুষ পেলে না, গয়েশ্বরী দেবীর গায়ে ঢলে পড়লে কোন্ আক্কেলে? এক্ষুনি বার কর পঞ্চাশটি টাকা, প্রায়শ্চিত্তিরের খরচ, নইলে তোমার নিস্তার নেই।

এই সময়ে চক্রধরের একজন চাকর এসে পড়ায় কাশীনাথ বেঁচে গেলেন। পুরুত ঠাকুরটি বললেন, তা বেশ তো, গয়া দিদি আর এই কাশীনাথ ছোকরা দুজনেই যখন চক্রধরবাবুর আপনার লোক তখন তিনিই একটা মীমাংসা করবেন।

চক্রধর মুখুজ্যে বোঝেন যে তপ্ত অবস্থায় ঘা দিলেই লোহার সঙ্গে লোহা জুড়ে যায়। তিনি কালবিলম্ব না করে প্রথমে তাঁর ভাগনীকে প্রস্তাবটি জানালেন। গয়েশ্বরী আশ্চর্য হয়ে বললেন, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি মামা? চক্রধর সবিস্তারে জানালেন, লোকটা বাতিকগ্রস্ত হলেও ভালমানুষ, সহজেই পোষ মানবে, আর তার বিস্তর টাকাও আছে। বয়স কম তাতে হয়েছে কি? আজকাল ও সব কেউ ধরে না। গয়েশ্বরী অতি বুদ্ধিমতী মহিলা, মামার প্রস্তাবটি সহজেই তাঁর হৃদয়ংগম হল। পরিশেষে বললেন, তা ও ছোঁড়া যদি রাজী হয় তো আমার আর আপত্তি কি, লোকে কি বলবে তা আমি গ্রাহ্য করি না।

কাশীনাথ অত সহজে বাগ মানলেন না। বললেন, কি পাগলের

মতন বলছ চক্রধর কাকা! গয়েশ্বরীর বয়েস যে আমার প্রায় ডবল। সেকালে কুলীন কন্যার অমন বিবাহ হত বটে, কিন্তু আমি তো পেশাদার পাণিগ্রাহী নই।

চক্রধর বললেন, বেশ করে সব দিক ভেবে দেখ কাশী বাবাজী। মেয়েটি অতি নিষ্ঠাবতী, সব রকম বার ব্রত পালন করে, মায় আমড়া-ষষ্ঠী পর্যন্ত। দরজীর দোকান চালায় বটে, কিন্তু ওর চালচলন তোমারই মতন সেকেলে। দোকানটা তোমারই হাতে আসবে, তোমার আয় বেড়ে যাবে।

—কিন্তু বয়েসের যে আকাশ-পাতাল তফাত।

—খুব ঠিক কথা। তোমার ইতিহাস যা বলেছ তাতে তোমার আসল বয়েস এখন দু শ পঞ্চাশের বেশী, আর গয়েশ্বরীর মোটে উনপঞ্চাশ। তোমার তুলনায় ও তো খুকী। আরও বুঝে দেখ, তোমার শরীরটাই জোয়ান, কিন্তু মনটা দু সেঞ্চুরি পিছিয়ে আছে। গয়েশ্বরীর সংগে তোমার মনের মিল সহজেই হবে। আরও একটা কথা, আধুনিক পণ্ডিতরা বলেন, মেয়েদের পূর্ণযৌবন হয় পঞ্চাশের পরে। মর্তমান কলা খেয়েছ তো? পাকলেই সুতার হয় না। যার খোসাটি কালচিটে হয়ে কুঁচকে গেছে, শাঁসটি মজে গিয়ে একটু নরম হয়েছে, সেই পরিপক্ক কলাই অমৃত। মেয়েরাও সেই রকম। এখনকার পঞ্চাশীর কাছে তোমাদের সেকেলে ষোড়শী-চৌড়শী দাঁড়াতেই পারে না।

চক্রধরের যুক্তি শুনে কাশীনাথ ধীরে ধীরে বশে এলেন। একটু চিন্তা করে বললেন, আমি যখন মারা গিয়েছিলাম তখন আমার চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী রাসেশ্বরীর বয়েস ছিল তোমার ভাগনী গয়েশ্বরীরই মতন। এখন মনে হচ্ছে রাসেশ্বরীই গয়েশ্বরী হয়ে ফিরে এসেছে। আচ্ছা, তুমি ঘটক লাগাতে পার।

—আমিই তো ঘটক। গয়েশ্বরীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, সে রাজী আছে। এখন পাকা দেখাটা হয়ে গেলেই বিবাহ হতে পারবে। আজ বিকেল বেলা তুমি তার বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ ক'রো।

—তোমারও উপস্থিত থাকা চাই চক্রকাকা।

—না না, তা দস্তুর নয়, শুধু তোমরা দুজনে আলাপ করবে।

কাশীনাথকে দেখে গয়েশ্বরী একটু হেসে বললেন, কি হে ছোকরা, আমাকে মনে ধরেছে তো?

কাশীনাথ নীরবে উপরে নীচে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

—তোমার নাকি পাঁচ লাখ টাকা আছে? শোন কত্তা, বিয়েটা চুকে গেলেই সব টাকা আমার হাতে দেবে। তুমি যে রকম ন্যালাখ্যাপা মানুষ তোমার হাতে টাকা থাকলে গেছি আর কি, লোকে সব ঠকিয়ে নেবে। আমার মামাবাবুটিকেও বিশ্বাস করি না।

কাশীনাথ বললেন, ভয় নেই গয়েশ্বরী ঠাকরুন, আমাকে ঠকাতে পারে এমন মানুষ ভূভারতে নেই। যা মতলব করেছি বলি শোন। মেয়েছেলের দোকানদারি ভাল নয়, বিয়ের পর তোমার দোকানটা বেচে দেব। তার টাকা আর আমার যা আছে তা দিয়ে তেজারতি করব। চক্রকাকা বলেন আজকাল জমিদারি কেনা যায় না। তোমার কোনও অভাব রাখব না, এক গা গহনা গড়িয়ে দেব। এই কলকাতা হচ্ছে অসুরের শহর, ভয়ংকর জায়গা, আমরা রাঘবপুর গ্রামে গিয়ে বাস করব। বাড়ি বাগান পুকুর গোয়াল সব হবে, একটি দেবমন্দির আর চতুষ্পাঠীও হবে।

গয়েশ্বরী হাত নেড়ে ঝংকার করে বললেন, আ মরি মরি, কি

মতলবই ঠাউরেছ ঠাকুর মশাই! পাগল কি আর গাছে ফলে, তুমি একটি আস্ত উন্মাদ পাগল। শোন হে ছোকরা, তোমার স্ত্রী হলেও আমি বয়সে বড়, গুরুজন তুল্যি। আমার হেপাজতে তুমি থাকবে, আমার বশেই তোমাকে চলতে হবে।

কাশীনাথ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন, তার পর 'তারা ব্রহ্মময়ী রক্ষা কর মা' বলেই চলে গেলেন।

সন্ধ্যাহ্নিকের পর কাশীনাথ ইষ্টদেবীকে নিজের অবস্থা নিবেদন করলেন।—এ কি বিপদে ফেললে মা! তোমারই বা দোষ কি, নিজের কুবুদ্ধিরই ফল ভোগ করছি। পৃথিবীতে কলি যে এত প্রবল হয়েছে তা তো ভাবতে পারি নি। ব্রাহ্মণের বাড়ি বাবুর্চি রাঁধছে, মুরগি চরছে, বুড়ী মাগীরা জুতো পরে খটমটিয়ে চলছে, ধাড়ী মেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে। ছোট লোকের আস্পর্ধা বেড়ে গেছে, ব্রাহ্মণকে গ্রাহ্য করে না, সামনেই বিড়ি খায়। এখানে জাত ধর্ম কিছুই রক্ষা পাবে না। ওই গয়েশ্বরী একটা ভয়ংকরী খান্ডার মাগী, ওকে বিয়ে করলে আমার নরকভোগের আর বাকী থাকবে না। চক্রধর একটা পাষণ্ড কুলাঙ্গার, আমার বংশধর হতেই পারে না, যমরাজ নিশ্চয় ভুল করে ওর কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। কালী কৈবল্যদায়িনী, উপায় বাতলাও মা।

শেষরাত্রে কাশীনাথ স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর ইষ্টদেবী আবির্ভূত হয়ে হাত নেড়ে বলছেন, সরে পড় কাশীনাথ। তখনই কাশীনাথের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বুঝলেন, এই পাপ সংসারে ফিরে আসা তাঁর মস্ত বোকামি হয়েছে। মন স্থির করে কাশীনাথ তখনই যমদত্ত সেই নিষ্ক্রান্তি বটিকাটি গিলে ফেললেন এবং অবিলম্বে যমলোকে প্রয়াণ করলেন।

সকাল বেলা কাশীনাথকে পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, থ্রম্বোসিস।

এত কম বয়সে বড় একটা দেখা যায় না, তবে পাগলদের এরকম হয়ে থাকে।

চক্রধর তখনই কাশীনাথের পইতে থেকে চাবি নিতে গেলেন, কিন্তু পেলেন না। তাড়াতাড়ি ব্যাগটা দখল করতে গেলেন, কিন্তু তাও খুঁজে পেলেন না। নিশ্চয় গয়েশ্বরী ভোগা দিয়ে সেটা হাতিয়েছে এই ভেবে তিনি ভাগনীর বাড়ি ছুটলেন। দুজনের তুমুল ঝগড়া হল, কিন্তু ব্যাগ পাওয়া গেল না। কাশীনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যমদত্ত সম্পত্তি যম-সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

১৮৭৮

গগন চটি

হাতিবাগানের দরজী আবুবকর মিঞা আর তার বউ রমজানী বিবি সন্ধ্যার সময় পশ্চিম আকাশে ঈদের চাঁদ দেখছিল। হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস রমজানীর নজরে পড়ল। সে তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, ও মিঞা, আসমানের মধ্যিখানে ছোট্ট কাটারির মতন জ্বলজ্বল করছে ওটা কি গো? আবুবকর অনেকক্ষণ ঠাহর করে বলল, কাটারি নয় রে, ওটা পয়জার, দেখছিস না তালতলার চটির মতন গড়ন। বোধ হয় মল্লিকবাবুরা ফানুস উড়িয়েছে।

আবুবকরের অনুমান ঠিক নয়, কারণ পরদিন এবং তার পর রোজই সন্ধ্যার পর আকাশে দেখা গেল। এই অদ্ভুত বস্তু ফানুসের মতন এদিক ওদিক ভেসে বেড়ায় না, আকাশে স্থির হয়েও থাকে না, চাঁদ আর গ্রহ-নক্ষত্রর মতন এর উদয়-অস্ত হয়। উদীয়মান জ্যোতিঃ-সম্রাট তারক সান্যালকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ওটা রাহু বলেই মনে হচ্ছে, মহাবিপদের পূর্বলক্ষণ। এই কথা শুনে প্রবীণ জ্যোতিঃসম্রাট শশধর আচার্য বললেন, তারকটা গোমূর্খ, রাহু হলে মুণ্ডুর মতন গড়ন হত না? ওটা কেতু, ল্যাজের মতন দেখাচ্ছে। অতি ভীষণ দুর্নিমিত্ত সূচনা করছে। তোমাদের উচিত গ্রহশান্তির জন্য যাগ করা আর অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিসংকীর্তন।

একটা আতঙ্ক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। খবরের কাগজে নানারকম মন্তব্য প্রকাশিত হতে লাগল। একজন লিখলেন, বোধ হয় উড়ন চাকতি, ধাক্কা লেগে তুবড়ে গিয়ে চটিজুতোর মতন দেখাচ্ছে। আর একজন লিখলেন, নিশ্চয় ল্যাজকাটা ধূমকেতু, সূর্যের আর একটু

কাছে এলেই নূতন ল্যাজ গজাবে, তার ঝাপটায় পৃথিবী চুরমার হতে পারে।

প্রবীণ হেডপণ্ডিত কুঞ্জবিহারী তলাপাত্র কাগজে লিখলেন, এই আকাশচারী ভয়ংকর পাদুকা কোন্ মহাপুরুষের? দেখিয়া মনে হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। মধ্যশিক্ষাপর্ষদের খামখেয়াল দেখিয়া সেই স্বর্গস্থ তেজস্বী মহাত্মার ধৈর্যচ্যুতি হইয়াছে, তাই তাঁহার এক পাটি বিনামা গগনতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই উড়ুক্কু গগন-চটি শীঘ্রই শিক্ষাপর্ষদের মস্তকে নিপতিত হইবে।

সরকার-বিরোধী দলের অন্যতম মুখপাত্র বিরূপাক্ষ মণ্ডল লিখলেন, না, বিদ্যাসাগরের চটি নয়, তার শুঁড় এত বড় ছিল না। এই আসমানী পয়জার হচ্ছে স্বর্গস্থ মনীষী ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের। যত সব মেডিক্যাল কলেজ আর হাসপাতালের কেলেঙ্কারি দেখে তিনি খেপে উঠেছেন, হাতের কাছে অন্য হাতিয়ার না পেয়ে এক পাটি চটি ছেড়েছেন। কর্তারা হুঁশিয়ার।

ভক্তকবি হেমন্ত চট্টরাজ লিখলেন, এই গগন-চটি মানুষের নয়, এ হচ্ছে মূর্তিমান ঐশ রোষ। চুরি ঘুষ ভেজাল মিথ্যাচার ব্যভিচার ভণ্ডামি ইত্যাদি পাপের বৃদ্ধি, রাজ্যসরকারের অকর্মণ্যতা, ধনীদের বিলাসবাহুল্য, ছেলেমেয়েদের সিনেমোন্মাদ, এই সব দেখে নটরাজ চঞ্চল হয়েছেন, প্রলয়নাচন নাচবার জন্য ডান পা বাড়িয়েছেন, তা থেকেই এই রুদ্র চটি গগনতলে খসে পড়েছে। প্রলয়ংকর রুদ্রতাণ্ডব শুরু হতে আর দেরি নেই, জগতের ধ্বংস একবারে আসন্ন। দেশের ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ আবালবৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ যদি শীঘ্র ধর্মপথে ফিরে না আসে তবে এই রুদ্ররোষ সকলকেই ব্যাপাদিত করবে।

কিন্তু আনাড়ী লোকদের এই সব জল্পনা শিক্ষিত জনের মনে লাগল না। বিশেষজ্ঞরা কি বলেন? বিশ্বম্ভর কটন মিল, বিশ্বম্ভর

ব্যাংক, বিশ্বম্ভরী পত্রিকা ইত্যাদির মালিক শ্রীবিশ্বম্ভর চক্রবর্তী একজন সর্ববিদ্যাবিশারদ লোক, কোনও প্রশ্নের উত্তরে তিনি 'জানি না' বলেন না। কিন্তু গগন-চটির কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি শুধু গম্ভীরভাবে উপর নীচে ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নাড়লেন। কয়েকজন অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বললেন, এখন কিছু বলা যায় না, তবে নক্ষত্র নয় তা নিশ্চিত, কারণ এর গতিপথ বিষুববৃত্তের ঠিক সমান্তরাল নয়। এই আগন্তুক জ্যোতিষ্কটি গ্রহের মতন বিপথগামী। পুচ্ছহীন ধূমকেতু হতে পারে। তা ভয়ের কারণ আছে বইকি। সাদা চোখে যতই ছোট দেখাক বস্তুটি নিশ্চয় প্রকাণ্ড। দেখা যাক আমাদের কোদাইক্যানাল মানমন্দির আর গ্রীনিচ প্যালোমার ইত্যাদি থেকে কি রিপোর্ট আসে।

রিপোর্ট শীঘ্রই এল, দেশ-বিদেশের সমস্ত বিখ্যাত মানমন্দির থেকে একই সংবাদ প্রচারিত হল। দুর্বোধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাদ দিয়ে যা দাঁড়ায় তা এই।—সূর্যের নিকটতম গ্রহ হচ্ছে বুধ (মার্কারি), তার পরে আছে শুক্র (ভিনস), তার পর আমাদের পৃথিবী, তার পর মঙ্গল (মার্স), তার পর বহু দূরে বৃহস্পতি (জুপিটার)। আরও দূরদূরান্তরে শনি (সাটার্ন), ইউরেনস, নেপচুন আর প্লুটো। মঙ্গল আর বৃহস্পতির কক্ষের মাঝামাঝি পথে প্রকাণ্ড এক ঝাঁক অ্যাস্টারয়েড বা ছোট ছোট খণ্ডগ্রহ সূর্যকে পরিক্রমণ করে। তারই একটা হঠাৎ কক্ষভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীর নিকটে এসে পড়েছে। এই খণ্ডগ্রহটি গোলাকার নয়। ভারতীয় জ্যোতিষীরা এর নাম দিয়েছেন গগন-চটি অর্থাৎ হেভেনলি স্লিপার। আপাতত আমরাও সেই নাম মেনে নিলাম। এই গগন-চটির কিঞ্চিৎ স্বকীয় দীপ্তি আছে, তার

উপর সূর্যকিরণ পড়ায় আরও দীপ্তিমান হয়েছে। পৃথিবী থেকে এর বর্তমান দূরত্ব পৌনে দু কোটি মাইল, প্রায় দু বৎসরে সূর্যকে পরিক্রমণ করছে। এর আয়তন আর ওজন চন্দ্রের প্রায় দ্বিগুণ। এত বড় অ্যাস্টারয়েডের অস্তিত্ব জানা ছিল না। অনুমান হয়, গোটা কতক খণ্ডগ্রহের সংঘর্ষ আর মিলনের ফলে উৎপন্ন হয়ে এই গগন-চটি ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। এর উত্তাপ আর স্বকীয় দীপ্তিও সংঘর্ষ-জনিত। এই বৃহৎ অ্যাস্টারয়েড নিকটে আসায় মঙ্গল গ্রহ আর চন্দ্রের কক্ষ একটু বেঁকে গেছে, আমাদের জোয়ার ভাটার সময়ও কিছু বদলেছে। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব এখন পর্যন্ত যা আছে তাতে বিশেষ ভয়ের কারণ নেই, তবে সন্দেহ হচ্ছে গগন-চটি ক্রমেই কাছে আসছে। যদি বেশী কাছে আসে তবে আমাদের এই পৃথিবীর পরিণাম কি হবে তা ভাবতেও হৃৎকম্প হয়।

এই বিবৃতির ফলে অনেকে ভয়ে আঁতকে উঠল, কয়েকজন স্থূলকায় ধনী হার্টফেল করে মারা গেল। অনেকে পেটের অসুখ, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি আর হাঁপানিতে ভুগতে লাগল। হিন্দু-ধর্মের নেতৃস্থানীয় স্বামী-মহারাজগণ, মুসলমান মোল্লা-মওলানাগণ এবং খ্রীষ্টীয় পাদরীগণ নিজের নিজের শাস্ত্র অনুসারে হিতোপদেশ দিতে লাগলেন। সাহিত্যিকরা উপন্যাস কবিতা রম্যরচনা প্রভৃতি বর্জন করে পরলোকের কথা লিখতে লাগলেন। কিন্তু বেশির ভাগ লোকের দুশ্চিন্তা দেখা গেল না, বরং গগন-চটির হুজুগে পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা জমে উঠল। শেয়ারবাজারে বিশেষ কোনও তেজিমন্দি দেখা গেল না, সিনেমার ভিড়ও কমল না।

কিছুদিন পরেই দফায় দফায় যে জ্যোতিষিক সংবাদ আসতে লাগল তাতে লোকের পিলে চমকে উঠল, রক্ত জল হয়ে গেল। গগন-চটি নামক এই দুষ্টগ্রহ ক্রমশ পৃথিবীর নিকটবর্তী হচ্ছে এবং মহাকর্ষের নিয়ম অনুসারে পরস্পর টানাটানি চলছে। চন্দ্রসমেত পৃথিবী আর গগন-চটি যেন মিলে মিশে তাল-গোল পাকাবার চেষ্টায় আছে। হিসাব করে দেখা গেছে, পাঁচ মাসের মধ্যেই চন্দ্র আর গগন-চটির সংঘর্ষ হবে, তার পর দুটোই হুড়মুড় করে পৃথিবীর উপর পড়বে। তার ফল যা দাঁড়াবে তার তুলনায় লক্ষ হাইড্রোজেন বোমা তুচ্ছ। সংঘাতের কিছু পূর্বেই বায়ুমণ্ডল লুপ্ত হবে, সমুদ্র উৎক্ষিপ্ত হবে, সমস্ত প্রাণী রুদ্ধশ্বাস হয়ে মরবে। চরম ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের কিছু করণীয় নেই।

বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মুখপাত্রগণ একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচার করলেন—আমাদের করণীয় অবশ্যই আছে। সেকালে বৃদ্ধরা একটি ছড়া বলতেন—If cold air reach you through a hole, Go make your will and mend your soul । কিন্তু এই আগন্তুক গগন-চটি ছিদ্রাগত শীতল বায়ু নয়, মানবজাতির পাপের জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত মৃত্যুদণ্ড, আমাদের সকলকেই ধ্বংস করবে। উইল করা বৃথা, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে আমাদের আত্মার ত্রুটি অবশ্যই শোধন করতে হবে। অতএব সরল অন্তঃকরণে সমস্ত পাপ স্বীকার কর, নিরন্তর প্রার্থনা কর, ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা কর, সকল শত্রুকে ক্ষমা কর, যে কদিন বেঁচে আছ যথাসাধ্য অপরের দুঃখ দূর কর।

ইহুদী মুসলমান আর বৌদ্ধ ধর্মনেতারাও অনুরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন। আদি-শংকরাচার্যের একমাত্র ভাগিনেয়ের বংশধর ১০০৮শ্রী ব্যোমশংকর মহারাজ একটি হিন্দী পুস্তিকা ছাপিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ কপি বিলি করলেন। তার সার মর্ম এই।—অয় মেরে বচ্চে, হে

আমার বৎসগণ, মৃত্যুভয় ত্যাগ কর। আমার বয়স নব্বই পেরিয়েছে, আর তোমরা প্রায় সকলেই আমার চাইতে ছোট, কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, কারণ ভবযন্ত্রণার ভোগ বালক-বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই সমান। আমাদের আত্মা শীঘ্রই দেহপিঞ্জর থেকে মুক্তি পেয়ে পরমাত্মায় লীন হবে, এ তো পরম আনন্দের কথা, এতে ভয়ের কি আছে? কিন্তু অশুচি অবস্থায় দেহত্যাগ করা চলবে না, তাতে নরকগতি হবে। তোমরা হয়তো জান, কোনও বড় অপারেশনের আগে রোগীকে উপবাসী রাখা হয় এবং জোলাপ আর এনিমা দিয়ে তার কোষ্ঠ সাফ করা হয়। যখন রোগীর পাকস্থলী শূন্য, মলভাণ্ড শূন্য, মূত্রাশয়ও শূন্য, সর্ব শরীর পরিষ্কৃত, তখনই ডাক্তার অস্ত্রপ্রয়োগ করেন। শুচিতার জন্য এত সতর্কতার কারণ—পাছে সেপটিক হয়। এখন ভেবে দেখ, অ্যাপেনডিক্স বা হার্নিয়া বা প্রস্টেট ছেদনের তুলনায় প্রাণ-বিসর্জন কত গুরুতর ব্যাপার। মৃত্যুকালে যদি মনে কিছুমাত্র কালুষ্য বা কল্মষ বা কিল্বিষ থাকে তবে আত্মার সেপসিস অনিবার্য। পাপক্ষালন না করেই যদি তোমরা প্রাণত্যাগ কর তবে নিঃসন্দেহ সোজা নরকে যাবে। অতএব আর বিলম্ব না করে সরল মনে লজ্জা ভয় ত্যাগ করে সমস্ত পাপ স্বীকার কর, তাতেই তোমরা শুচি হবে। চুপি চুপি বললে চলবে না, জনতার সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে, কিংবা ছাপিয়ে প্রচার করতে হবে, যেমন আমি করছি। এই পুস্তিকার শেষে তফসিল ক আর খ-এ মৎকৃত যাবতীয় দুষ্কর্মের তালিকা পাবে—কতগুলো ছারপোকা মেরেছি, কতবার লুকিয়ে মুরগি খেয়েছি, কতবার মিথ্যা বলেছি, কতজন ভক্তিমতী শিষ্যার প্রতি কুদৃষ্টিপাত করেছি—সবই খোলসা করে বলা হয়েছে। তোমরাও আর কালবিলম্ব না করে এখনই পাপক্ষালনে রত হও।

বিলাতে অক্সফোর্ড গ্রুপের উদ্যোগে দলে দলে নরনারী দুষ্কৃতি

স্বীকার করতে লাগল, অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দেশেও অনুরূপ শুদ্ধির আয়োজন হল। ভারতবাসীর লজ্জা একটু বেশী, সেজন্য ব্যোম-শংকরজীর উপদেশে প্রথম প্রথম বিশেষ ফল হল না। কিন্তু সম্প্রতি প্যালোমার মানমন্দির থেকে যে রিপোর্ট এসেছে তার পরে কেউ আর চুপ করে থাকতে পারে না। গগন-চটি আরও কাছে এসে পড়েছে, তার ফলে পৃথিবীর অভিকর্ষ বা গ্রাভিটি কমে গেছে, আমরা সকলেই একটু হালকা হয়ে পড়েছি। আর দেরি নেই, শেষের সেই ভয়ংকর দিনের জন্য প্রস্তুত হও।

মনুমেণ্টের নীচে আর শহরের সমস্ত পার্কে দলে দলে মেয়ে-পুরুষ চিৎকার করে পাপ স্বীকার করতে লাগল। বড়বাজার থেকে একটি বিরাট প্রসেশন ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে বেরুল এবং নেতাজী সুভাষ রোড হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করতে লাগল। বিস্তর মান্যগণ্য লোক তাতে যোগ দিয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে করুণ কণ্ঠে নিজের নিজের দুষ্কর্ম ঘোষণা করতে লাগলেন, কিন্তু ব্যাণ্ডের আওয়াজে তাঁদের কথা ঠিক বোঝা গেল না।

বিলাতী রেডিওতে নিরন্তর বাজতে লাগল— Nearer my God to Thee। দিল্লীর রেডিওতে 'রঘুপতি রাঘব' এবং লখনউ আর পাটনায় 'রাম নাম সচ হৈ' অহোরাত্র নিনাদিত হল। কলকাতায় ধ্বনিত হল—'সমুখে শান্তিপারাবার'। মস্কো রেডিও নীরব রইল, কারণ ভগবানের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সদ্‌ভাব নেই। অবশেষে সোভিএট রাষ্ট্রদূতের সনির্বন্ধ অনুরোধে আমাদের রাষ্ট্রপতি কমিউনিস্ট প্রজাবৃন্দের আত্মার সদ্‌গতির নিমিত্ত গয়াধামে অগ্রিম পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করলেন।

বৃহৎ চতুঃশক্তি অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিএট যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের শাসকবর্গ গত পঞ্চাশ বৎসরে যত কুকর্ম করেছেন

তার ফিরিস্তি দিয়ে White Book প্রকাশ করলেন এবং একযোগে ঘোষণা করলেন—সব মানুষ ভাই ভাই, কিছুমাত্র বিবাদ নাই। পাকিস্তানের কর্তারা বললেন, য়হ বাত তো ঠিক হৈ, হিন্দী পাকী ভাই ভাই, লেকিন আগে কাশ্মীর চাই।

জগদ্‌ব্যাপী এই প্রচণ্ড বিক্ষোভের মধ্যে শুধু একজনের কোনও রকম চিত্তচাঞ্চল্য দেখা গেল না। ইনি হচ্ছেন হাঠখোলার ভুবনেশ্বরী দেবী। বয়স আশি পার হলেও ইনি বেশ সবলা, সম্প্রতি দ্বিতীয় বার কেদার-বদরী ঘুরে এসেছেন। প্রচুর সম্পত্তি, স্বামী পুত্র কন্যার ঝঞ্ঝাট নেই, শুধু একপাল আশ্রিত কুপোষ্য আছে, তাদের ইনি কড়া শাসনে রাখেন। ভুবনেশ্বরী খুব ভক্তিমতী মহিলা, গীতগোবিন্দ গীতা আর গীতাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করেছেন। কিন্তু পাড়ার লোকে তাঁকে ঘোর নাস্তিক মনে করে, কারণ তিনি কোনও রকম হুজুগে মাতেন না। তাঁর ভয়ার্ত পোষ্যবর্গ ব্যাকুল হয়ে অনুরোধ করল, কর্তা-মা, গগন-চটি উদয় হয়েছেন, প্রলয়ের আর দেরি নেই। জগন্নাথ ঘাটে সভা হচ্ছে, সবাই পাপ কবুল করছে, আপনিও করে ফেলুন। মন খোলসা হলে শান্তিতে মরতে পারবেন।

ভুবনেশ্বরী ধমক দিয়ে বললেন, পাপ যা করেছি তা করেছি, ঢাক পিটিয়ে সবাইকে তা বলতে যাব কেন রে হতভাগারা? গগন-চটি না ঢেঁকি, আকাশে লাখ লাখ তারা আছে, আর একটা না হয় এল, তাতে হয়েছে কি? তোরা বললেই প্রলয় হবে? মরতে এখন ঢের দেরি রে, এখনই হা-হুতোশ করছিস কেন? ভগবান আছেন কি করতে? 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে'—রবি ঠাকুরের

এই গান শুনিস নি? মানুষকেই যদি ঝাড়ে বংশে লোপাট করে ফেলেন তবে ভগবানের আর বেঁচে সুখ কি? লীলাখেলা করবেন কাকে নিয়ে? যা যা, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমো গে।

কিসে কি হয় কিছুই বলা যায় না। হয়তো ভুবনেশ্বরীর কথায় ত্রিভুবনেশ্বরের একটু চক্ষুলজ্জা হল। হয়তো কার্যকারণ-পরম্পরায় প্রাকৃতিক নিয়মেই যা ঘটবার তা ঘটল। হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে তিন ইঞ্চি হরফে ছাপা হল—ভয় নেই, দুষ্ট গ্রহ দূর হচ্ছে। বড় বড় জ্যোতিষীরা একযোগে জানিয়েছেন, বৃহস্পতি শনি ইউরেনস আর নেপচুন এই চারটে প্রকাণ্ড গ্রহের সঙ্গে এক রেখায় আসার ফলে গগন-চটির পিছনে টান পড়েছে, সে দ্রুতবেগে পুরাতন কক্ষে নিজের সঙ্গীদের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে। অতি অল্পের জন্য আমাদের পৃথিবী বেঁচে গেল।

বিপদ কেটে যাওয়ায় জনসাধারণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, কিন্তু যাঁরা অসাধারণ তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। দেশের হোমরাচোমরা মান্যগণ্যদের প্রতিনিধিস্থানীয় একটি দল দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে নিবেদন করলেন, হুজুর, আমরা যে বিস্তর কসুর কবুল করে ফেলেছি এখন সামলাব কি করে? প্রধানমন্ত্রী সুপ্রীম কোর্টের চীফ জস্টিসের মত চাইলেন। তিনি রায় দিলেন, পুলিসের পীড়নের ফলে কেউ যদি অপরাধ স্বীকার করে তবে তা আদালতে গ্রাহ্য হয় না। গগন-চটির আতঙ্কে লোকে যা বলে ফেলেছে তারও আইনসম্মত কোনও মূল্য নেই, বিশেষত যখন স্ট্যাম্প কাগজে কেউ অ্যাফিডাভিট করে নি।

বৃহৎ চতুঃশক্তি এবং ইউ-এন-ও গোষ্ঠীভুক্ত ছোট বড় সকল রাষ্ট্র একটি প্রোটোকলে স্বাক্ষর করে ঘোষণা করলেন, গগন-চটির

আবির্ভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে আমরা যেসব প্রলাপোক্তি করেছিলাম তা এতদ্দ্বারা প্রত্যাহৃত হল। এখন আবার পূর্বাবস্থা চলবে।

গগন-চটি সুদূর গগনে বিলীন হয়েছে, কিন্তু যাবার আগে সকলকেই বিলক্ষণ ঘা কতক দিয়ে গেছে। আমাদের মান ইজ্জত ধূলিসাৎ হয়েছে, মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে আর দাঁড়াবার জো নেই।

১৮৭৯

অদল বদল

কালিদাসের মেঘদূত ব্যাপারটা কি বোধ হয় আপনারা জানেন। যদি ভুলে গিয়ে থাকেন তাই একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি। কুবেরের অনুচর এক যক্ষ কাজে ফাঁকি দিত, সেজন্য প্রভুর শাপে তাকে এক বৎসর নির্বাসনে থাকতে হয়। সে রামগিরিতে আশ্রম তৈরি করে বাস করতে লাগল। আষাঢ়ের প্রথম দিনে যক্ষ দেখল, পাহাড়ের মাথায় মেঘের উদয় হয়েছে, দেখাচ্ছে যেন একটি হস্তী বপ্রক্রীড়া করছে। অঞ্জলিতে সদ্য ফোটা কুড়চি ফুল নিয়ে সে মেঘকে অর্ঘ্য দিল এবং মন্দাক্রান্তা ছন্দে একটি সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করল। তার সার মর্ম এই।—ভাই মেঘ, তোমাকে একবার অলকাপুরী যেতে হচ্ছে। ধীরে সুস্থে যেয়ো, পথে কিঞ্চিৎ ফুর্তি করতে গিয়ে যদি একটু দেরি হয়ে যায় তাতে ক্ষতি হবে না। অলকায় তোমার বউদিদি আমার বিরহিণী প্রিয়া আছেন, তাঁকে আমার বার্তা জানিয়ে আশ্বস্ত ক'রো। ব'লো, আমার শরীর ভালই আছে, কিন্তু চিত্ত তাঁর জন্য ছটফট করছে। নারায়ণ অনন্তশয্যা থেকে উঠলেই অর্থাৎ কার্তিক মাস নাগাদ শাপের অবসান হবে, তার পরেই আমরা পুনর্মিলিত হব।

কালিদাস তাঁর যক্ষের নাম প্রকাশ করেন নি, শাপের এক বৎসর শেষ হলে সে নিরাপদে ফিরতে পেরেছিল কিনা তাও লেখেন নি। মহাভারতে উদ্যোগপর্বে এক বনবাসী যক্ষের কথা আছে, তার নাম স্থূণাকর্ণ। সেই যক্ষ আর মেঘদূতের যক্ষ একই লোক তাতে সন্দেহ নেই। কালিদাস তাঁর কাব্যের উপসংহার লেখেন নি, মহাভারতেও

যক্ষের প্রকৃত ইতিহাস নেই। কালিদাস আর ব্যাসদেব যা অনুক্ত রেখেছেন সেই বিচিত্র রহস্য এখন উদ্‌ঘাটন করছি।

যক্ষপত্নীকে যক্ষিণী বলব, কারণ তার নাম জানা নেই। পতির বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে যক্ষিণী দিনযাপন করছিল। একটা বেদীর উপর সে প্রতিদিন একটি করে ফুল রাখত আর মাঝে মাঝে গুনে দেখত ৩৬৫ পূরণের কত বাকী। অবশেষে এক বৎসর পূর্ণ হল, কার্তিক মাসও শেষ হল, কিন্তু যক্ষের দেখা নেই। যক্ষিণী উৎকণ্ঠিত হয়ে আরও কিছুদিন প্রতীক্ষা করল, তার পর আর থাকতে না পেরে কুবেরের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

কুবের বললেন, কে গা তুমি? খুব তো সুন্দরী দেখছি, কিন্তু কেশ অত রুক্ষ কেন? বসন অত মলিন কেন? একটি মাত্র বেণী কেন?

যক্ষিণী সরোদনে বলল, মহারাজ, আপনার সেই কিংকর যাকে এক বৎসরের জন্য নির্বাসনদণ্ড দিয়েছিলেন, আমি তারই দুঃখিনী ভার্যা। আজ দশ দিন হল এক বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এখনও আমার স্বামী ফিরে এলেন না কেন?

কুবের বললেন, ব্যস্ত হচ্ছ কেন, ধৈর্য ধর, নিশ্চয় সে ফিরে আসবে। হয়তো কোথাও আটকে পড়েছে। তার জোয়ান বয়েস, এখানে শুধু নাক-থেবড়া যক্ষিণী আর কিন্নরীই দেখেছে, বিদেশে হয়তো কোনও রূপবতী মানবীকে দেখে তার প্রেমে পড়েছে। তুমি ভেবো না, মানবীতে অরুচি হলেই সে ফিরে আসবে।

সজোরে মাথা নেড়ে যক্ষিণী বলল, না না, আমার স্বামী তেমন নন, অন্য নারীর দিকে তিনি ফিরেও তাকাবেন না। এই সেদিন একটি

মেঘ এসে তাঁর আকুল প্রেমের বার্তা আমাকে জানিয়ে গেছে। প্রভু, আপনি দয়া করে অনুসন্ধান করুন, নিশ্চয় তাঁর কোনও বিপদ হয়েছে, হয়তো সিংহব্যাঘ্রাদি তাঁকে বধ করেছে।

কুবের বললেন, তুমি অত উতলা হচ্ছ কেন? তোমার স্বামী যদি ফিরে নাই আসে তবু তুমি অনাথা হবে না। আমার অন্তঃপুরে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে, আমি তোমাকে খুব সুখে রাখব।

যক্ষিণী বলল, ও কথা বলবেন না প্রভু, আপনি আমার পিতৃ-স্থানীয়। আপনার আজ্ঞায় আমার স্বামী নির্বাসনে গিয়েছিলেন, এখন তাঁর দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হয়েছে, তাঁকে ফিরিয়ে আনা আপনারই কর্তব্য। যদি তিনি বিপদাপন্ন হন তবে তাঁকে উদ্ধার করুন, যদি মৃত হন তবে নিশ্চিত সংবাদ আমাকে এনে দিন, আমি অগ্নিপ্রবেশ করে স্বর্গে তাঁর সঙ্গে মিলিত হব।

বিব্রত হয়ে কুবের বললেন, আঃ তুমি আমাকে জ্বালিয়ে মারলে। বেশ, এখনই আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে যাচ্ছি, রামগিরি জায়গাটা দেখবার ইচ্ছাও আমার আছে। তুমিও আমার সঙ্গে চল। ওরে, শীঘ্র পুষ্পক রথ জুততে বলে দে। আর তোরা দুজন তৈরি হয়ে নে, আমার সঙ্গে যাবি।

রামগিরি প্রদেশে একটি ছোট পাহাড়ের উপর যক্ষ তার আশ্রম বানিয়েছিল। সেখানে পৌঁছে কুবের দেখলেন, বাড়িটি বেশ সুন্দর, দরজা জানালাও আছে, কিন্তু সবই বন্ধ। কুবেরের আদেশে তাঁর এক অনুচর দরজায় ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, ওহে স্থূণাকর্ণ, এখনই বেরিয়ে এস, মহামহিম রাজরাজ কুবের স্বয়ং এসেছেন, তোমার বউও এসেছে।

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। কুবের বললেন, বাড়িতে কেউ নেই মনে হচ্ছে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া যাক।

যক্ষিণী বলল, অমন কাজ করবেন না মহারাজ। আমার স্বামী এই বাড়িতেই আছেন, আমি মাছ ভাজার গন্ধ পাচ্ছি, নিশ্চয় উনি রান্নায় ব্যস্ত আছেন, আহা, কেউ তো সাহায্য করবার লোক নেই। আমিই ওকে ডাকছি। ওগো, শুনতে পাচ্ছ? আমি এসেছি, মহারাজও এসেছেন। রান্না ফেলে রেখে চট করে তুমি বেরিয়ে এসো।

একটি জানালা ঈষৎ ফাঁক হল। ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে উত্তর এলো, অ্যাঁ, প্রিয়ে তুমি এসেছ, প্রভু এসেছেন? কি সর্বনাশ, তাঁর সামনে আমি বেরুব কি করে?

আশ্চর্য হয়ে কুবের বললেন, কে গো তুমি? এখনই বেরিয়ে এসো, নয় তো বাড়িতে আগুন লাগাব।

তখন দরজা খুলে একটি অবগুণ্ঠিতা নারীমূর্তি বেরিয়ে এল। কুবের ধমক দিয়ে বললেন, আর ন্যাকামি করতে হবে না, তোমার ঘোমটা খোল।

মাথা নীচু করে ঘোমটাবতী উত্তর দিল, প্রভু, এ মুখ দেখাব কি করে?

কুবের বললেন, পুড়িয়েছ নাকি? ভেবো না, শিব যাতে চড়েন সেই বৃষভের সদ্যোজাত গোময় লেপন করলেই সেরে যাবে।

যক্ষিণী হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে এক টানে ঘোমটা খুলে ফেলল। মাথা চাপড়ে নারীমূর্তি বলল, হায় হায়, এর চাইতে আমার মরণই ভাল ছিল।

কুবের প্রশ্ন করলেন, কে তুমি? সেই স্থূণাকর্ণ যক্ষটা কোথায় গেল? তুমি তার রক্ষিতা নাকি?

—মহারাজ, আমিই আপনার হতভাগ্য কিংকর স্থূণাকর্ণ, দৈব-

দুর্বিপাকে এই দশা হয়েছে, কিন্তু আমার কোনও অপরাধ নেই। প্রিয়ে, আমরা নিতান্তই হতভাগ্য, শাপান্ত হলেও আমাদের মিলন হবার উপায় নেই।

যক্ষিণী বলল, মহারাজ, ইনিই আমার স্বামী, ওই যে, জোড়া ভুরু রয়েছে, নাকের ডগায় সেই তিলটিও দেখা যাচ্ছে। হা নাথ, তোমার এমন দশা কেন হল? কোন্ দেবতাকে চটিয়েছিলে?

যক্ষ বলল, পরের উপকার করতে গিয়ে আমার এই দুরবস্থা হয়েছে। এই জগতে কৃতজ্ঞতা নেই, সত্যপালন নেই।

যক্ষিণী বলল, তুমি মেয়েমানুষ হয়ে গেলে কি করে?

কুবের বললেন, এ রকম হয়ে থাকে। বুধপত্নী ইলা আগে পুরুষ ছিলেন, হরপার্বতীর নিভৃত স্থানে প্রবেশের ফলে স্ত্রী হয়ে যান। বালী-সুগ্রীবের বাপ ঋক্ষরজা এক সরোবরে স্নান করে বানরী হয়ে গিয়েছিলেন। যাই হক, স্থূণাকর্ণ, তুমি সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে বল।

যক্ষ বলতে লাগল।—মহারাজ, প্রায় তিন মাস হল কিছু শুখনো কাঠ সংগ্রহের জন্য আমি নিকটবর্তী ওই অরণ্যে গিয়েছিলাম। দেখলাম, গাছের তলায় একটি ললনা বসে আছে আর আকুল হয়ে অশ্রুপাত করছে।

যক্ষিণী প্রশ্ন করল, মাগী দেখতে কেমন?

—সুন্দরী বলা চলে, তবে তোমার কাছে লাগে না। কাটখোট্টা গড়ন, মুখে লাবণ্যেরও অভাব আছে। মহারাজ, তার পর শুনুন। আমি সেই নারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভদ্রে, তোমার কি হয়েছে? যদি বিপদে পড়ে থাক তবে আমি যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা করব।

সে এই আশ্চর্য বিবরণ দিল।—মহাশয়, আমি পঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা শিখণ্ডিনী, কিন্তু লোকে আমাকে রাজপুত্র শিখণ্ডী বলেই জানে। পূর্বজন্মে আমি ছিলাম কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা। স্বয়ংবরসভা থেকে ভীষ্ম আমাদের তিন ভগিনীকে হরণ করেছিলেন, তাঁর বৈমাত্র ভাই বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য। আমি শাল্বরাজের প্রতি অনুরক্তা জেনে ভীষ্ম আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। শাল্ব বললেন, রাজকন্যা, আমি তোমাকে নিতে পারি না, কারণ ভীষ্ম তোমাকে হরণ করেছিলেন, তাঁর স্পর্শ নিশ্চয় তোমাকে পুলকিত করেছিল। তখন আমি ভগবান পরশুরামের শরণ নিলাম। তিনি ভীষ্মকে বললেন, তোমারই কর্তব্য অম্বাকে বিবাহ করা। ভীষ্ম সম্মত হলেন না। পরশুরাম তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না। ভীষ্মের জন্যই আমার নারীজন্ম বিফল হল এই কারণে ভীষ্মের বধকামনায় আমি কঠোর তপস্যা করলাম। তাতে মহাদেব প্রীত হয়ে বর দিলেন—তুমি পরজন্মে দ্রুপদকন্যা রূপে ভূমিষ্ঠ হবে, কিন্তু পরে পুরুষ হয়ে ভীষ্মকে বধ করবে। মহাদেবের বরে দ্রুপদ-গৃহে আমার জন্ম হল। কন্যা হলেও রাজপুত্র শিখণ্ডী রূপেই আমি পালিত হয়েছি, অস্ত্রবিদ্যাও শিখেছি। যৌবনকাল উপস্থিত হলে দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মার কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হল। কিন্তু কিছুদিন পরেই ধরা পড়ে গেলাম। আমার পত্নী দাসীকে দিয়ে তার মায়ের কাছে বলে পাঠাল—মাগো, তোমাদের ভীষণ ঠকিয়েছে, যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছ সে পুরুষ নয়, মেয়ে।

এই দুঃসংবাদ শুনে আমার শ্বশুর হিরণ্যবর্মা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি দূত পাঠিয়ে আমার পিতা দ্রুপদকে জানালেন, দুর্মতি, তুমি আমাকে প্রতারিত করেছ। আমি সসৈন্যে তোমার রাজ্যে যাচ্ছি, চারজন চতুরা যুবতীও আমার সঙ্গে যাচ্ছে, তারা আমার

জামাতা শিখণ্ডীকে পরীক্ষা করবে। যদি দেখা যায় যে সে পুরুষ নয় তবে তোমাকে আমি অমাত্যপরিজনসহ বিনষ্ট করব।

পিতার এই দারুণ বিপদ দেখে আমি গৃহত্যাগ করে এই বনে পালিয়ে এসেছি। আমার জন্যই স্বজনবর্গ বিপন্ন হয়েছেন, আমার আর জীবনে প্রয়োজন কি। আমি এখানেই অনাহারে জীবন বিসর্জন দেব।

যক্ষরাজ, শিখণ্ডিনীর এই ইতিহাস শুনে আমার অত্যন্ত অনুকম্পা হল। আমি তাকে বললাম, তুমি কি চাও বল। আমি ধনপতি কুবেরের অনুচর, অদেয় বস্তুও দিতে পারি।

শিখণ্ডিনী বলল, যক্ষ, আমায় পুরুষ করে দাও।

আমি বললাম, রাজকন্যা, আমার পুরুষত্ব কয়েক দিনের জন্য তোমাকে ধার দেব, তাতে তুমি তোমার পিতা ও আত্মীয়বর্গকে দশার্ণরাজের ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই তুমি এখানে এসে আমার পুরুষত্ব ফিরিয়ে দেবে। আমার শাপান্ত হতে আর বিলম্ব নেই, প্রিয়ার সঙ্গে মিলনের জন্য আমি অধীর হয়ে আছি, অতএব তুমি সত্বর ফিরে এসো।

মহারাজ, শিখণ্ডিনী সেই যে চলে গেল তার পর আর আসে নি। সেই মিথ্যাবাদিনী দ্রুপদনন্দিনী ধাপ্পা দিয়ে আমার পুরুষত্ব আদায় করে পালিয়েছে, তার বদলে দিয়ে গেছে তার তুচ্ছ নারীত্ব।

যক্ষের কথা শুনে যক্ষিণী বলল, একটা অজানা মেয়ের কান্নায় ভুলে গিয়ে তোমার অমূল্য সম্পদ তাকে দিয়ে দিলে! নাথ, তুমি কি বোকা, কি বোকা!

কুবের বললেন, তুমি একটি গজমূর্খ গর্দভ গাড়ল। যাই হক, এখনই আমি তোমার পুরুষত্ব উদ্ধার করে দেব। চল আমার সঙ্গে।

সকলে পঞ্চাল রাজ্যে উপস্থিত হলেন। রাজধানী থেকে কিছু দূরে এক নির্জন বনে পুষ্পক রথ রেখে কুবের তাঁর এক অনুচরকে বললেন, দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডীকে সংবাদ দাও—বিশেষ প্রয়োজনে ধনেশ্বর কুবের তোমাকে ডেকেছেন, যদি না এস তবে পঞ্চাল রাজ্যের সর্বনাশ হবে।

শিখণ্ডী ব্যস্ত হয়ে তখনই এসে প্রণাম করে বললেন, যক্ষরাজ, আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়?

কুবের বললেন, শিখণ্ডী, তুমি আমার কিংকর এই স্থূণাকর্ণকে প্রতারিত করেছ, এর প্রিয়ার সঙ্গে মিলনে বাধা ঘটিয়েছ, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা রক্ষা কর নি। যদি মঙ্গল চাও তবে এখনই এর পুরুষত্ব প্রত্যার্পণ কর।

শিখণ্ডী বললেন, ধনেশ্বর, আমি অবশ্যই প্রতিশ্রুতি পালন করব, আমার বিলম্ব হয়ে গেছে তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। এই যক্ষ আমার মহোপকার করেছেন, কৃপা করে আরও কিছুদিন আমায় সময় দিন।

কুবের বললেন, কেন, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নি?

—যক্ষরাজ, যে বিপদ আসন্ন ছিল তা কেটে গেছে। দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মার সঙ্গে যে যুবতীরা এসেছিল তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পরীক্ষা করে তাঁকে বলেছে, আপনার জামাতা পূর্ণমাত্রায় পুরুষ, বরং ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা। এই কথা শুনে শ্বশুর মহাশয় অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে আমার পিতার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এবং বিস্তর উপঢৌকন দিয়ে সদলবলে প্রস্থান করেছেন। যাবার সময় তাঁর কন্যাকে বোকা মেয়ে বলে ধমক দিয়ে গেছেন। আমি এই যক্ষ মহাশয়ের কাছে আর এক মাস সময় ভিক্ষা চাচ্ছি, তার মধ্যেই কুরুক্ষেত্র

যুদ্ধ সমাপ্ত হবে। ভীষ্মকে বধ করেই আমি স্থূণাকর্ণের ঋণ শোধ করব।

কুবের বললেন, মহারথ ভীষ্মকে তুমি বধ করবে এ কথা অবিশ্বাস্য। তিনিই তোমাকে বধ করবেন, সেই সঙ্গে তোমার পুরুষত্বও বিনষ্ট হবে। ও সব চলবে না, তুমি এই মুহূর্তে স্থূণাকর্ণের পুরুষত্ব প্রত্যর্পণ কর এবং তোমার স্ত্রীত্ব ফিরিয়ে নাও। নতুবা আমি সাক্ষী-প্রমাণ নিয়ে এখনই তোমার শ্বশুরের কাছে যাব। তোমার প্রতারণার কথা জানলেই তিনি সসৈন্যে এসে পঞ্চাল রাজ্য ধ্বংস করবেন।

ব্যাকুল হয়ে শিখণ্ডী বললেন, হা, আমার গতি কি হবে।

কুবের বললেন, ভাবছ কেন, তোমার ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন আছেন, পঞ্চপাণ্ডব ভগিনীপতি আছেন, পাণ্ডবসখা কৃষ্ণ আছেন। তাঁরাই ভীষ্মবধের ব্যবস্থা করবেন।

শিখণ্ডী বললেন, তা হবার জো নেই। ভীষ্ম পাণ্ডবদের পিতামহ, আর দ্রোণ তাঁদের আচার্য। এই দুই গুরুজনকে তাঁরা বধ করবেন না, এই কারণে ভীষ্মবধের ভার আমার উপর আর দ্রোণবধের ভার ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর পড়েছে।

কুবের কোনও আপত্তি শুনলেন না। অবশেষে নিরুপায় হয়ে শিখণ্ডী যক্ষকে পুরুষত্ব প্রত্যর্পণ করে নিজের স্ত্রীত্ব ফিরিয়ে নিলেন। তখন কুবেরের সঙ্গে যক্ষ আর যক্ষিণী পরমানন্দে অলকাপুরীতে চলে গেল।

বিষণ্ণমনে অনেকক্ষণ চিন্তা করে শিখণ্ডী কৃষ্ণসকাশে এলেন। দৈবক্রমে দেবর্ষি নারদও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণ বললেন, একি শিখণ্ডী, তোমাকে এমন অবসন্ন দেখছি কেন? দুদিন

আগেও তোমার বীরোচিত তেজস্বী মূর্তি দেখেছিলাম, এখন আবার কোমল স্ত্রীভাব দেখছি কেন?

শিখণ্ডী বললেন, বাসুদেব, আমার বিপদের অন্ত নেই।

নারদ বললেন, তোমরা বিশ্রম্ভালাপ কর, আমি এখন উঠি।

শিখণ্ডী বললে, না না দেবর্ষি, উঠবেন না। আপনি তো আমার ইতিহাস সবই জানেন, আপনার কাছে আমার গোপনীয় কিছু নেই।

সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে শিখণ্ডী বললেন, কৃষ্ণ, তুমি পাণ্ডব আর পাঞ্চালদের সুহৃদ, আমার ভগিনী কৃষ্ণা তোমার সখী। আমাকে সংকট হতে উদ্ধার কর। বিগত জন্ম থেকেই আমার সংকল্প আছে যে ভীষ্মকে বধ করব, মহাদেবের বরও আমি পেয়েছি। কিন্তু পুরুষত্ব না পেলে আমি যুদ্ধ করব কি করে?

কৃষ্ণ বললেন, তোমার সংকল্প ধর্মসংগত নয়। নারী হয়ে জন্মেছ, অলৌকিক উপায়ে পুরুষ হতে চাও কেন? ভীষ্মকে বধ করবার ভার অন্য লোকের উপর ছেড়ে দাও। দেবর্ষি কি বলেন?

নারদ বললেন, ওহে শিখণ্ডী, কৃষ্ণ ভালই বলেছেন। শাল্বরাজ আর ভীষ্ম তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাতে হয়েছে কি? পৃথিবীতে আরও পুরুষ আছে। তুমি যদি সম্মত হও তবে আমি তোমার পিতাকে বলব, তিনি যেন কোনও সৎপাত্রে তোমাকে অর্পণ করেন। তাতেই তোমার নারীজন্ম সার্থক হবে। তোমার পত্নীরও একটা গতি হয়ে যাবে, সে তোমার সপত্নী হয়ে সুখে থাকবে।

শিখণ্ডী বললেন, অমন কথা বলবেন না দেবর্ষি। মহাদেব আমাকে যে বর দিয়েছেন তা অবশ্যই সফল হবে। কৃষ্ণ, তোমার অসাধ্য কিছু নেই, তুমি আমাকে পুরুষ করে দাও।

কৃষ্ণ বললেন, আমি বিধাতা নই যে অঘটন ঘটাব। সেই যক্ষের মতন কেউ যদি স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গে অঙ্গ বিনিময় করে তবেই তুমি

পুরুষ হতে পারবে। কিন্তু সেরকম নির্বোধ আর কেউ আছে বলে মনে হয় না। দেবর্ষি, আপনি তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়ান, আপনার জানা আছে?

নারদ বললেন, আছে, তুমিও তাঁকে জান। শোন শিখণ্ডী, বৃন্দাবন ধামে কৃষ্ণের এক দূর সম্পর্কের মাতুল আছেন। তিনি গোপবংশীয়, নাম আয়ান ঘোষ। অতি সদাশয় পরোপকারী লোক, কিন্তু বড়ই মনঃকষ্টে আছেন, ধর্মকর্ম নিয়েই থাকেন, সংসারে আসক্তি নেই। তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও।

শিখণ্ডী বললেন, বাসুদেব, তুমি আমার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করে শ্রীআয়ানকে একটি পত্র দাও, তাই নিয়ে আমি তাঁর কাছে যাব।

কৃষ্ণ বললেন, পাগল হয়েছ? আমার নাম যদি ঘুণাক্ষরে উল্লেখ কর তবে তখনই তিনি তোমাকে বিতাড়িত করবেন। দেখ শিখণ্ডী, আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ, অকারণে আমি কয়েকজনের বিরাগভাজন হয়েছি—কংস, শিশুপাল, আর আমার পূজ্যপাদ মাতুল এই আয়ান ঘোষ। এমন কি, আমার পুত্র শাম্বের শ্বশুর দুর্যোধনও আমার শত্রু হয়েছেন।

শিখণ্ডী বললেন, তবে উপায়?

নারদ বললেন, উপায় তোমারই হাতে আছে। নারীর ছলা-কলা আর পুরুষের কূটবুদ্ধি দুটিই তোমার স্বভাবসিদ্ধ, তাই দিয়েই কাজ উদ্ধার করতে পারবে। চল আমার সঙ্গে, শ্রীআয়ানের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।

বৃন্দাবনের এক প্রান্তে লোকালয় হতে বহু দূরে যমুনাতীরে একটি কুটীর নির্মাণ করে আয়ান ঘোষ সেখানে বাস করেন। বিকাল বেলা নদীপুলিনে বসে তিনি রাবণরচিত শিবতাণ্ডব স্তোত্র আবৃত্তি

করছিলেন, এমন সময় শিখণ্ডীর সঙ্গে নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন।

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে আয়ান বললেন, দেবর্ষি, আমি ধন্য যে আপনার দর্শন পেলাম। এই সুন্দরীকে তো চিনতে পারছি না।

নারদ বললেন, ইনি পঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা শিখণ্ডিনী। ভগবান শূলপাণি একটি কঠোর ব্রত পালনের ভার এঁর উপর দিয়েছেন। সেই ব্রত উদ্‌যাপিত না হওয়া পর্যন্ত এঁকে অনূঢ়া থাকতে হবে। কিন্তু কোনও সদাশয় ধর্মপ্রাণ পুরুষের সাহায্য ভিন্ন এঁর সংকল্প পূর্ণ হবে না। মহামতি আয়ান, আমি দিব্যচক্ষুতে দেখছি তুমিই সেই ভাগ্যবান পুরুষ। এঁর অনুরোধ রক্ষা কর, ব্রত সমাপ্ত হলেই এই অশেষ গুণবতী ললনা তোমাকে পতিত্বে বরণ করবেন, তোমার জীবন ধন্য হবে।

একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে আয়ান বলেন, হা দেবর্ষি, আমার জীবন কি করে ধন্য হবে? আমার সংসার থাকতেও নেই, গৃহ শূন্য। লোকে আমাকে অবজ্ঞা করে, অপদার্থ কাপুরুষ বলে, অন্তরালে ধিক্‌কার দেয়। তাই জনসংস্রব বর্জন করে এই নিভৃত স্থানে বাস করছি। এই বরবর্ণিনী রাজকন্যা আমার ন্যায় হতভাগ্যের কাছে কেন এসেছেন?

শিখণ্ডী মধুর কণ্ঠে বললেন, গোপশ্রেষ্ঠ মহাত্মা আয়ান, আপনার গুণরাশি শুনে দূর থেকেই আমি মোহিত হয়েছিলাম, এখন আপনাকে দেখে আমি অভিভূত হয়েছি, আপনার চরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করছি।

আয়ান বললেন, আমার বঞ্চিত ধিক্‌কৃত জীবনে এমন সৌভাগ্যের উদয় হবে তা আমি স্বপ্নেও আশা করি নি। মনোহারিণী শিখণ্ডিনী, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। আমার কাছে তুমি কি চাও বল।

শিখণ্ডী বললেন, দেবর্ষি, আপনিই এঁকে বুঝিয়ে দিন।

ব্রতের কথা সংক্ষেপে জানিয়ে নারদ বললেন, গোপেশ্বর আয়ান, মহাদেবের বরে শিখণ্ডিনী অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করবেন, তোমাকে কেবল এক মাসের জন্য এঁকে তোমার পুরুষত্ব দান করতে হবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তার মধ্যেই সমাপ্ত হবে, ভীষ্মও স্বর্গলাভ করবেন। তার পরেই রাজা দ্রুপদ তাঁর এই কন্যাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করবেন, পঞ্চাল রাজ্যের অর্ধ অংশ ও বিস্তর সবৎসা ধেনুও যৌতুক স্বরূপ দেবেন। বৃন্দাবনের অপ্রিয় স্মৃতি পশ্চাতে ফেলে রেখে তুমি নূতন পত্নীসহ নূতন দেশে পরম সুখে রাজত্ব করবে।

ক্ষণকাল চিন্তার পর আয়ানের দ্বৈধ দূর হল, তিনি তাঁর ভাবী বধূর প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। পুনর্বার পুরুষত্ব লাভ করে শিখণ্ডী হৃষ্টচিত্তে নারদের সঙ্গে চলে গেলেন। তার পর স্ত্রীরূপী আয়ান কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করে অসূর্যম্পশ্যা হয়ে শিখণ্ডিনীর প্রত্যাশায় দিন যাপন করতে লাগলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দশম দিনে শিখণ্ডীর বাণে জর্জরিত হয়ে ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করলেন। তার আট দিন পরে যুদ্ধ সমাপ্ত হল। কিন্তু শিখণ্ডী আয়ানের কাছে এলেন না, তাঁর আসবার উপায়ও ছিল না। অশ্বত্থামা গভীর নিশীথে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করে যাঁদের হত্যা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শিখণ্ডীও ছিলেন।

আয়ানের ভাগ্যে রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব লাভ হল না, তাঁর পুরুষত্বও শিখণ্ডীর সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর জীবন বিফল হল এমন কথা বলা যায় না। কালক্রমে আয়ানের এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবর্তন হল। তিনি মনঃপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করে

আয়নী নামে খ্যাত হলেন, শ্রীখোল বাজাতে শিখলেন, এবং ব্রজমণ্ডলে যে ষোল হাজার গোপিনী বাস করত তাদের নেত্রী হয়ে নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তন করতে লাগলেন।

১৮৭৯

রাজমহিষী

হংসেশ্বর রায় খুব ধনী লোক। রাধানাথপুরে তাঁর যে জমিদারি ছিল তা এখন সরকারের দখলে গেছে, কিন্তু তাতে হংসেশ্বরের গায়ে আঁচড় লাগে নি। কলকাতায় অফিস অঞ্চলে আর শৌখিন পাড়ায় তাঁর ষোলটা বড় বড় বাড়ি আছে, তা থেকে মাসে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা আয় হয়। তা ছাড়া বন্ধকী কারবার আর বিস্তর শেয়ারও আছে। হংসেশ্বরের বয়স পঞ্চাশ। তাঁর পত্নী হেমাঙ্গিনী সংসারে অনাসক্ত, বিপুল শরীর নিয়ে বিছানায় শুয়ে ঔষধ আর পুষ্টিকর পথ্য খেয়ে গল্পের বই পড়ে দিন কাটান আর মাঝে মাঝে বাড়ির লোকদের ধমক দেন—যত সব কুঁড়ের বাদশা জুটেছে। এঁদের একমাত্র সন্তান চকোরী, সম্প্রতি এম.এ. পাস করেছে।

কলকাতা হংসেশ্বরের ভাল লাগে না। তাঁর যে সব শখ আছে তার চর্চার পক্ষে রাধানাথপুরই উপযুক্ত স্থান, তাই ওখানেই তিনি বাস করেন। তাঁর প্রকাণ্ড বাগান আছে, গরু আর হাঁস-মুরগিও আছে। কৃষিজাত দ্রব্য আর পশুপক্ষীর যত প্রদর্শনী হয় তাতে তাঁর আম কাঁঠাল লাউ কুমড়ো গরু হাঁস মুরগিই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায়। সম্প্রতি তিনি পশ্চিম পঞ্জাবের গুজরানওআলা থেকে একটি ভাল জাতের মোষ আনিয়েছেন, তার জন্যে তাঁর এক পাকিস্তানী বন্ধুকে প্রচুর ঘুষ দিতে হয়েছে। তিনি মোষটির নাম রেখেছেন রাজমহিষী। কিছু দিন আগে তার প্রথম বাচ্চা হয়েছে। আগামী ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাট্‌ল শো-তে তিনি এই মোষটিকে পাঠাবেন। তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন তালদিঘির রায়সাহেব মহিম বাঁড়ুজ্যে, তাঁর একটি মুলতানী মোষ

আছে। হংসেশ্বর আশা করেন তাঁর রাজমহিষীই রাজ্যপাল গোল্ড মেডাল পাবে।

হংসেশ্বরের মেয়ে চকোরী কলকাতায় তার মামাদের তত্ত্বাবধানে থেকে কলেজে পড়ত। এখন পড়া শেষ করে রাধানাথপুরে তার বাপ-মায়ের কাছে আছে, মাঝে মাঝে দু-দশ দিনের জন্যে কলকাতায় যায়। চকোরী লম্বা, রোগা, দাঁত বড় বড়, চোয়াল উঁচু, গায়ের স্বাভাবিক রঙ ময়লা। সর্বাঙ্গীণ পরিপাটী মেক-অপ সত্ত্বেও তাকে সুন্দরী বলে ভ্রম হয় না। চকোরীর হিংসুটে সখীরা বলে, রূপ তো আহামরি বিদ্যাধরী, গুণে মা মনসা, শুধু ওর বাপের সম্পত্তির লোভে খোশামুদেগুলো জোটে।

মেয়ের বিবাহের জন্যে হেমাঙ্গিনীর কিছুমাত্র চিন্তা নেই, হংসেশ্বরও ব্যস্ত নন। তিনি বলেন, চকোরী হুঁশিয়ার হিসেবী মেয়ে, বোকা-হাবার মতন চোখ বুজে বাজে লোকের সঙ্গে প্রেমে পড়বে না, চটক দেখে বা মিষ্টি-মধুর বুলি শুনেও ভুলবে না। তাড়াহুড়োর দরকার কি, আজকাল তো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের পরে মেয়েদের বিয়ের রেওয়াজ হয়েছে। চকোরী সুবিধে মতন নিজেই যাচাই করে একটা ভাল বর জুটিয়ে নেবে।

চকোরীর প্রেমের যত উমেদার আছে তার মধ্যে সব চেয়ে নাছোড়-বান্দা হচ্ছে বংশীধর। সম্প্রতি সে পি-এচ. ডি. ডিগ্রী পেয়ে টালিগঞ্জ কলেজে একটা প্রোফেসরি পেয়েছে, বটানি আর জোঅলজি পড়ায়। তার বাবা শশধর চৌধুরী দু বছর হল মারা গেছেন। তিনি উকিল ছিলেন, হংসেশ্বরের কলকাতার সম্পত্তি তদারক করতেন। বংশীধরের মামার বাড়ি রাধানাথপুরে, সেখানে সে মাঝে মাঝে যায়।

চকোরীর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই তার পরিচয় আছে, হংসেশ্বরকে সে কাকাবাবু বলে।

পুজোর ছুটিতে বংশীধর রাধানাথপুরে এসেছে। একদিন সে চকোরীকে বলল, আর দেরি কেন, তোমার লেখাপড়া শেষ হয়েছে, আমারও যেমন হক একটা চাকরি জুটেছে। এখন আর তোমার আপত্তি কিসের? তুমি রাজী হলেই তোমার বাবাকে বলব।

চকোরী বলল, ব্যাপারটি যত সোজা মনে করছ তা নয়। আমার তরফ থেকে বলতে পারি, তোমাকে আমার পছন্দ হয়, বেশ শান্তশিষ্ট, যদিও নামটা বড় সেকেলে, বংশীধর শুনলেই মনে হয় সাপুড়ে। কিন্তু প্রেমে হাবুডুবু খাবার মেয়ে আমি নই। বাবাকে যদি রাজী করাতে পার তবে বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই। তবে বাবা লোকটি সহজ নন, নানা রকম ফেচাং তুলবেন। তোমার যদি সাহস আর জেদ থাকে তাঁকে বলে দেখতে পার।

পরদিন সকালে হংসেশ্বরের কাছে গিয়ে বংশীধর সবিনয়ে নিবেদন করল যে তার কিছু বলবার আছে। হংসেশ্বর তখন তাঁর মোষের প্রাতঃকৃত্য তদারক করছিলেন। বংশীধরকে বললেন, একটু সবুর কর। তার পর তিনি রাজমহিষীর পরিচারককে বললেন, এই গোপীরাম, বেশ পরিষ্কার করে গা মুছিয়ে দিবি, খবরদার একটুও কাদা যেন লেগে না থাকে। একি রে, নাকের ডগায় মশা কামড়েছে দেখছি, ওর ঘরে ডিডিটি দিস নি বুঝি?

গোপীরাম বলল, বহুত দিয়েছি হুজুর, কিন্তু দিদি দিলে মচ্ছড় ভাগে না। আপনি যদি হুকুম করেন তবে আমার গাঁও থেকে চারঠো বগুলা মাঙাতে পারি।

—বগুলা কি জিনিস?

—বগ-পাখি হুজুর। গোহালে রাখলে মখ্‌খি মচ্ছড় পতিংগা

মকড়া সব টপাটপ খেয়ে ফেলবে, ভঁইসী আর তার বচ্চা বহুত আরামসে নিদ যাবে।

—বগ থাকবে কেন, পালিয়ে যাবে।

—না হুজুর, ওদের পংখ্ একটু ছেঁটে দিব, উড়তে পারবে না। পন্দ্র দিন বাদ গাঁও সে আমার এক চাচা আসবে, বলেন তো বগুলা আনতে লিখে দিব, চার বগুলায় বিশ টাকা অন্দাজ খর্চ পড়বে।

—বেশ, আজই লিখে দে।

গোপীরামকে আরও কিছু উপদেশ দিয়ে হংসেশ্বর তাঁর অফিস-ঘরে বংশীধরকে নিয়ে গেলেন। প্রশ্ন করলেন, তার পর বংশী, ব্যাপারটা কি হে?

মাথা নীচু করে হাত কচলাতে কচলাতে বংশীধর বলল, কাকাবাবু, অনেক দিনের একটা দুরাশা আছে, তাই আপনার সম্মতি ভিক্ষা করতে এসেছি।

হংসেশ্বর বললেন, অ। চকোরীকে বিয়ে করতে চাও এই তো?

বংশীধর সভয়ে বলল, আজ্ঞে হাঁ।

হংসেশ্বর বললেন, শোন বংশী, আমি স্পষ্ট কথার মানুষ। পাত্র হিসেবে তুমি ভালই, দেখতে চকোরীর চাইতে ঢের বেশী সুশ্রী, বিদ্যাও আছে, যত দূর জানি চরিত্রও ভাল। কিন্তু তোমার আর্থিক অবস্থা তো সুবিধের নয়। কলকাতায় একটা সেকেলে পৈতৃক বাড়ি আছে বটে, কিন্তু সেখানে তোমার মা দিদিমা ভাই বোন ভাগনেরা গিশগিশ করছে, সেই ভিড়ের মধ্যে চকোরী এক মিনিটও টিকতে পারবে না। তার পর তোমার আয়। মাইনে কত পাও হে? দু শ? পরে আড়াই শ হবে? খেপেছ, ওই টাকায় চকোরীকে পুষতে চাও? তার সাবান ক্রীম পাউডার পেণ্ট লিপস্টিক সেণ্ট এই সবের খরচই তো মাসে আড়াই শ-র ওপর। তুমি হয়তো ভেবেছ মেয়ে-জামাইএর ভরণ-

পোষণের জন্যে আমি মাসে মাসে মোটা টাকা দেব। সেটি হবে না বাপু।

বংশীধর বলল, আমি গরিব হলেই বা ক্ষতি কি কাকাবাবু? চকোরী আপনার একমাত্র সন্তান, সে যাতে সুখে থাকে তার জন্যে আপনি অর্থসাহায্য করবেন এ তো স্বাভাবিক। আপনার অবর্তমানে ওই তো সব পাবে।

—অবর্তমান হতে ঢের দেরি হে, আমি এখনও চল্লিশ বছর বাঁচব, তার আগে এক পয়সাও হাতছাড়া করব না। মেয়ে যদ্দিন আইবুড়ো তদ্দিন আমার খরচে নবাবি করুক আপত্তি নেই, কিন্তু বিয়ের পর সমস্ত ভার তার স্বামীকে নিতে হবে। আর যদিই বা তোমাদের খরচ আমি যোগাই তাতে তোমার মাথা হেঁট হবে না? বাপের মাইনের গোলাম স্বামীর ওপর কোনও মেয়ের শ্রদ্ধা থাকে না। আমিই বা চ্যারিটি-বয় জামাই করতে যাব কেন?

বংশীধর কাতর স্বরে বলল, তবে কি আমার কোনও আশা নেই?

—আশা থাকতে পারে। তুমি উঠে পড়ে লেগে যাও যাতে তোমার রোজগার বাড়ে। তোমার মাসিক আয় আড়াই হাজার হলেই আমার আর আপত্তি থাকবে না।

—অত টাকা আয়ের তো কোনও আশা দেখছি না। আর, চকোরী কি তত দিন সবুর করবে?

—সবুর করবে কিনা আমি কি করে বলব। তুমিই তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পার। হাঁ, আর একটা কথা তোমার জেনে রাখা দরকার। চকোরীকে ভাঁওতা দিয়ে রাজী করিয়ে যদি আমার অমতে তাকে বিয়ে কর তবে আমার সমস্ত সম্পত্তি হরিণঘাটায় দান করব, গো-মহিষ-ছাগাদি পশু আর হংস-কুক্কুটাদি পক্ষীর উৎকর্ষকল্পে।

আর, চকোরী আমার সম্পত্তি পেলেই বা তোমার কি সুবিধে হবে? সে অতি ঝানু মেয়ে, কাকেও বিশ্বাস করে না, ব্যাংকের চেকবুক তোমাকে দেবে না, বিষয় যা পাবে তাতেও তোমাকে হাত দিতে দেবে না। বড় জোর তোমার সিগারেটের খরচ যোগাবে আর জন্মদিনে কিছু উপহার দেবে, এক সুট ভাল পোশাক, কি রিস্টওয়াচ, কিংবা একটা শার্পার-নাইণ্টি কলম। চকোরীকে বিয়ে করার মতলব ছেড়ে দেওয়াই তোমার পক্ষে ভাল।

বংশীধর বিষণ্ণ মনে চলে গেল। বিকাল বেলা তার কাছে সব কথা শুনে চকোরী বলল, বাবা যে ওই রকম বলবেন তা আমি আগে থাকতেই জানি।

বংশীধর বলল, চকোরী, তোমার বাবার সম্পত্তি তাঁরই থাকুক, আমার তাতে লোভ নেই। তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালবাস তবে ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে না? প্রেমের জন্যে নারী কি না ছাড়তে পারে? যদি ভালবাসা থাকে তবে আমার সেকেলে ছোট বাড়িতে আর সামান্য আয়েই তুমি সুখী হতে পারবে।

চকোরী হেসে বলল, শোন বংশী। প্রেম খুব উঁচুদরের জিনিস, আর তোমার ওপর আমার তা নেহাত কম নেই। কিন্তু টাকাহীন প্রেম আর চাকাহীন গাড়ি দুইই অচল, কষ্টের সংসারে ভালবাসা শুকিয়ে যায়। 'ধনকে নিয়ে বনকে যাব থাকব বনের মাঝখানে, ধন-দৌলত চাই না শুধু চাইব ধনের মুখপানে'—এ আমার পোষাবে না বাপু। তোমাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্যে বাবা অবশ্য অনেকটা বাড়িয়ে বলেছেন, আমাকে একবারে হার্টলেস রাক্ষুসী বানিয়েছেন। কিন্তু আমি অতটা বেয়াড়া নই। তবে বাবা নিতান্ত অন্যায় কিছু বলেন নি। আমি বলি কি, তোমার ওই প্রোফেসরি ছেড়ে দিয়ে কোনও ভাল চাকরির চেষ্টা কর। বাবার সঙ্গে মন্ত্রীদের আলাপ

আছে, ওঁকে ধরলে নিশ্চয় একটা ভাল পোস্ট তোমাকে দেওয়াতে পারবেন। প্রথমটা মাইনে কম হলেও পরে আড়াই-তিন হাজার হওয়া অসম্ভব নয়।

—তত দিন আমার জন্যে তুমি সবুর করে থাকবে?

—গ্যারাণ্টি দিতে পারব না। অক্ষয় প্রেম একটা বাজে কথা, ভবিষ্যতে তোমার আমার দুজনেরই মতিগতি বদলাতে পারে। যা বলি শোন। একটা ভাল সরকারী চাকরির জন্যে নাছোড়বান্দা হয়ে বাবাকে ধর। কিন্তু এখনই নয়, ওঁর মাথার এখন ঠিক নেই, দিনরাত ওই মোষটার কথা ভাবছেন। বাবার গুপ্তচর খবর এনেছে, তালদিঘির সেই মহিম বাঁড়ুজ্যের মুলতানী মোষ নাকি রোজ সাড়ে কুড়ি সের দুধ দিচ্ছে, আমাদের রাজমহিষীর চাইতে কিছু বেশী, যদিও দুটোই সমবয়সী তরুণী মোষ। বাবা তাই উঠে পড়ে লেগেছেন, রাজমহিষীকে কাপাস বিচির খোল, চীনাবাদাম, পালং শাগ, কড়াইশুঁটি, গাজর, টোমাটো, নারকেল-কোরা, কমলানেবুর রস, এই সব পুষ্টিকর জিনিস খাওয়াচ্ছেন, ভাইটামিন বি-কমপ্লেক্সও দিচ্ছেন। এগজিবিশনটা আগে চুকে যাক। রাজমহিষী যদি গোল্ড মেডাল পায় তবে বাবা খুব দিল-দরিয়া হবেন, তখন তাঁকে চাকরির জন্যে ধরবে।

আর এক মাস পরেই পশ্চিমবঙ্গ-গবাদি-পশু-প্রদর্শনী, কিন্তু হংসেশ্বর মহা বিপদে পড়েছেন, রাজমহিষী খাওয়া প্রায় ত্যাগ করেছে, দুধও নামমাত্র দিচ্ছে। যত নষ্টের গোড়া ওই গোপীরাম, রাজমহিষীর প্রধান সেবক। সে তার ইয়ারদের সঙ্গে রাসপূর্ণিমায় মেলায় গিয়ে খুব তাড়ি খেয়ে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, পুলিস এলে তাদের সঙ্গে বীরদর্পে লড়ে একটা কনস্টেবলের মাথা ফাটিয়েছিল।

তার ফলে তাকে গ্রেপতার করে থানায় চালান দেওয়া হয়। খবর পেয়ে তাকে খালাস করবার জন্যে হংসেশ্বর অনেক চেষ্টা করলেন, কলকাতা থেকে ভাল ব্যারিস্টার পর্যন্ত আনালেন। আদালতে তিনি প্রার্থনা করলেন, মোটা জরিমানা করে আসামীকে ছেড়ে দেওয়া হক। কিন্তু হাকিম তা শুনলেন না, ছ মাস জেলের হুকুম দিলেন। তখন ব্যারিস্টার বললেন, ইওর অনার, এই গোপীরাম যদি জেলে যায় তবে শ্রীহংসেশ্বর রায়ের সর্বনাশ হবে। তাঁর বিখ্যাত চ্যাম্পিয়ান বফেলো রাজমহিষী গোপীরামের বিরহে খাওয়া বন্ধ করেছে। না খেলে সে আগামী ক্যাট্‌ল শো-তে দাঁড়াবে কি করে? অতএব ইওর অনার দয়া করে মোটা জামিন নিয়ে আসামীকে এক মাসের জন্যে ছেড়ে দিন, প্রদর্শনী শেষ হলেই সে জেলে ঢুকবে। কিন্তু হাকিমটি অত্যন্ত এক-গুঁয়ে আর অবুঝ, কোনও আবদার শুনলেন না। তাই গোপীরাম এখন জেলে রয়েছে।

হংসেশ্বর পূর্বে বুঝতে পারেন নি যে মোষটা গোপীরামের এত নেওটা হয়ে পড়েছে। এখন তিনি অকূল পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছেন। গোপীরামের সহকারীরা কেউ ভয়ে এগোয় না, কাছে গেলেই রাজ-মহিষী গুঁতুতে আসে। শুধু হংসেশ্বরকে সে কাছে আসতে আর গায়ে হাত বুলুতে দেয়, কিন্তু তিনি খুব সাধাসাধি করেও তাকে খাওয়াতে পারলেন না।

হংসেশ্বরের এই সংকট শুনে বংশীধর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। তিনি তখন এক ছড়া সিংগাপুরী কলা মোষের নাকের সামনে ধরে লোভ দেখাচ্ছেন আর খাবার জন্যে অনুনয় করছেন, কিন্তু মোষ ঘাড় ফিরিয়ে নিচ্ছে।

বংশীধর বলল, কাকাবাবু, আমি কোনও সাহায্য করতে পারি কি?

হংসেশ্বর খেঁকিয়ে বললেন, গুঁতো খাবার ইচ্ছে হয় তো এগিয়ে আসতে পার।

হঠাৎ বংশীধরের মাথায় একটা মতলব এল। হংসেশ্বরের কাছ থেকে সরে এসে সে গোপীরামের সহকারীদের সঙ্গে কথা কয়ে রাজমহিষী সম্বন্ধে অনেক খবর জেনে নিল। তার পরদিন ভোরের ট্রেনে সে বর্ধমান জেলে গোপীনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেল। তার উদ্দেশ্য শুনে জেলার খুশী হয়ে অনুমতি দিলেন।

রাধানাথপুরে ফিরে এসেই হংসেশ্বরের কাছে গিয়ে বংশীধর বলল, কাকাবাবু, ভাববেন না, আপনার মোষ যাতে খায় তার ব্যবস্থা আমি করছি।

হংসেশ্বর বললেন ব্যবস্থাটা কি রকম শুনি? তুমি ওকে খাওয়াতে গেলেই তো গুঁতিয়ে দেবে।

—আমি নয়, আপনিই ওকে খাওয়াবেন। গোপীরামের সঙ্গে দেখা করে আমি সব হদিস জেনে নিয়েছি। ব্যাপার হচ্ছে এই।—মোষটাকে খাওয়াবার সময় গোপীরাম তার গায়ে হাত বুলিয়ে একটা গান গাইত। সেই গানটি না শুনলে রাজমহিষীর আহারে রুচি হয় না।

—এতো বড় অদ্ভুত কথা।

—আজ্ঞে, রুশ বিজ্ঞানী প্যাভলভ একেই বলেছেন কণ্ডিশণ্ড্ রিফ্লেক্স। আপনাকে গানটি শিখে নিতে হবে।

হংসেশ্বর বললেন, গান-টান আমার আসে না। যাই হক, গানটা কি শুনি?

বংশীধর বলল, কাকাবাবু, আমারও একটা কণ্ডিশন আছে। আগে

কবুল করুন—মোষ যদি আগের মতন খায় তবে আমাকে খুব মোটা বকশিশ দেবেন।

—কি চাও তুমি? চকোরীর সঙ্গে বিয়ে?

—চকোরীর কথা পরে হবে। আপনার তিনখানা বাড়ি আমাকে দেবেন, ব্রাবোর্ন রোডের সেই আটতলাটা, চৌরঙ্গীর ছতলাটা, আর সাদার্ন অ্যাভিনিউএর তেতলাটা।

—ওঃ, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয় ছোকরা! ওই তিনটে বাড়ি থেকে মাসে আমার প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার আসে তা জান?

—আজ্ঞে জানি বইকি। কিন্তু ওর কমে তো পারব না কাকাবাবু। ওই আয় যখন আমার হবে তখন চকোরীর সঙ্গে বিয়ে দিতে আপনার আর আপত্তি থাকবে না। আপনারও কিছু সুবিধে হবে, ইনকম ট্যাক্স আর ওয়েল্‌থ ট্যাক্স কম লাগবে।

—তুমি এত বড় শয়তান তা জানতুম না। যাই হক, যখন অন্য উপায় নেই তখন তোমার কথাতেই রাজী হলুম। রাজমহিষী যদি পেট ভরে খায় তবে তোমাকে ওই তিনটে বাড়ি দেব। কিন্তু যদি না খায় তবে তুমি এ বাড়ির ত্রিসীমায় আসবে না।

—যে আজ্ঞে।

—কথা তো দিলুম, এখন গানটা কি শুনি?

—আজ্ঞে, শোনাতে লজ্জা করছে, গানটা ঠিক ভদ্র সমাজের উপযুক্ত নয় কিনা। কিন্তু অন্য উপায় তো নেই, আমার কাছেই আপনাকে শিখে নিতে হবে। গোপীরামের গানটা হচ্ছে—

সোনামুখী রাজভঁইসী পাগল করেছে,
জাদু করেছে রে হামায় টোনা করেছে।
ঝুমে ঝুমে ঝুঁয় ঝুঁয়, ঝুমে ঝুমে ঝুঁয়।

—ও আবার কি রকম গান?

—গানটার একটু ইতিহাস আছে। গোপীরাম আগে দারভাঙগায় থাকত। সেখানে একটা পাগল বাঙালীদের বাড়ির সামনে ওই গানটা গাইত, তবে তার প্রথম লাইনটা একটু অন্যরকম—সোনামুখী বাঙালিনী পাগল করেছে। এই গান শুনলেই বাড়ির লোক দূর দূর করে পাগলটাকে তাড়িয়ে দিত। গোপীরাম সেই গানটা শিখে এসেছে, শুধু বাঙালিনীর জায়গায় রাজভঁইসী করেছে। আপনি আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে শিখুন, আজ রাত দশটা পর্যন্ত রিহার্সাল চলুক।

অত্যন্ত অনিচ্ছায় রাজী হয়ে হংসেশ্বর গানটা শেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বংশীধর বার বার সতর্ক করে দিল—রাজমহিষী নয় কাকাবাবু, বলুন রাজভঁইসী, আমায় নয়, বলুন হামায়। উচ্চারণটা ঠিক গোপীরামের মতন হওয়া দরকার। হাঁ, এইবার হয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানিক গলা সাধলেই সুরটি আয়ত্ত হবে।

সকাল বেলা হংসেশ্বর বললেন, দেখ বংশী, রাজমহিষীকে খাওয়াবার সময় তুমি আমার পিছনে থেকে প্রম্‌ট করবে, আমার সঙ্গে থাকলে তোমাকে গুঁতিয়ে দেবে না। আর একটা কথা—শুধু তুমি আর আমি থাকব, আর কেউ থাকলে আমি গাইতে পারব না।

বংশীধর বলল, ঠিক আছে, অন্য কারও থাকবার দরকারই নেই।

দু বালতি রাজভোগ বংশীধর রাজমহিষীর জন্যে বয়ে নিয়ে গেল, হংসেশ্বর তা গামলায় ঢেলে দিলেন। বংশীধর পিছনে গিয়ে বলল, কাকাবাবু, এইবার গানটা ধরুন।

মোষের পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে হংসেশ্বর মধুর স্বরে

বললেন; লক্ষ্মী সোনা আমার, পেট ভরে খাও, নইলে গায়ে গত্তি লাগবে কেন, দুধ আসবে কেন, সেই মুলতানীটা যে তোমাকে হারিয়ে দেবে। হুঁ হুঁ হুঁ—

সোনামুখী রাজভঁইসী পাগল করেছে,
জাদু করেছে রে হামায় টোনা করেছে—

মোষ ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। বংশীধর ফিসফিস করে বলল, থামবেন না কাকাবাবু, বেশ দরদ দিয়ে বার বার গাইতে থাকুন, শেষ লাইনের সুরে ভুল করবেন না, ঝমে ঝমে ঝঁয় ঝঁয় ঝমে ঝমে ঝঁয়—নিনি ধাপ্‌পা পা মা মাগ্‌গা গা রে সা।

তাল-মান-লয় ঠিক রেখে হংসেশ্বর তিনবার গানটা শেষ করলেন, তার পর চতুর্থবার ধরলেন—সোনামুখী রাজভঁইসী ইত্যাদি।

সহসা মোষ মাথা নামিয়ে গামলায় মুখ দিল। তার পর সেই নির্জন প্রাঙ্গণের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মৃদু মন্দ আওয়াজ উঠল—চবং চবং চবং। রাজমহিষী ভোজন করছেন।

পরবর্তী ঘটনাবলী সবিস্তারে বলবার দরকার নেই। পনরো দিনের মধ্যেই রাজমহিষীর বপু গজেন্দ্রাণীর তুল্য হল, গায়ে স্বল্প লোমের ফাঁকে ফাঁকে নিবিড় আলতা-কালির রঙ ফুটে উঠল, বিপুল পয়োধর থেকে প্রত্যহ পঁচিশ সের দুধ বেরুতে লাগল। পশ্চিমবঙ্গ-গবাদি-পশু-প্রদর্শনীতে সে মহিম বাঁড়ুজ্যের মুলতানী এবং অন্যান্য প্রতিযোগিনীদের অনায়াসে হারিয়ে দিল। রাজ্যপালী তার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিলেন, কৃষিমন্ত্রী সন্তর্পণে এক ছড়া রজনী-গন্ধার মালা তার গলায় পরিয়ে দিলেন। রাজমহিষী প্রসন্ন হয়ে সেই অর্ঘ্যটি গ্রহণ করে চিবুতে লাগল।

বংশীধরের নতুন আবদার শুনে হংসেশ্বর বললেন, আবার চাকরির শখ হল কেন? আমার বুকে বাঁশ দিয়ে তো যত পেরেছ বাগিয়ে নিয়েছ।

বংশীধর বলল, আজ্ঞে, একটা ভাল পোস্ট না পেলে যে আমার সেল্‌ফ-রেস্‌পেক্ট থাকবে না। লোকে বলবে, ব্যাটা শ্বশুরের বিষয় পেয়ে নবাবি করছে।

(একটি ইংরেজী গল্পের প্লটের অনুসরণে। লেখকের নাম মনে নেই।)

১৮৭৯

নবজাতক

সোমনাথের বউ উমা আসন্নপ্রসবা। পাশের ঘরে ডাক্তার নর্স ধাই মোতায়েন আছে। বাইরের বসবার ঘরে শুভাকাঙ্ক্ষী স্বজনবর্গ অপেক্ষা করছে, উমা আর সোমনাথ দুজনেরই ইচ্ছে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবামাত্র যেন সকলের আশীর্বাদ পায়। সোমনাথ অস্থির হয়ে এ ঘর ও ঘর করে বেড়াচ্ছে। ডাক্তার বার বার তাকে বোঝাচ্ছেন, অত উতলা হচ্ছেন কেন, হলেনই বা প্রথম পোয়াতী, আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য তো বেশ ভালই, কিছুমাত্র চিন্তার কারণ নেই।

সন্ধ্যা সাড়ে সাত। উদীয়মান জ্যোতিঃসম্রাট তারক সান্যাল তার হাতঘড়ি দেখে বলল, রেডিওর সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছি, করেক্ট টাইম। যদি ঠিক আটটা পাঁচ মিনিটে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তবে সে রাজচক্রবর্তী হবে। ডাক্তারের উচিত ততক্ষণ ছেলেকে ঠেকিয়ে রাখা।

নাস্তিক ভুজঙ্গ ভঞ্জ বলল, যত সব গাঁজা। তোমাদের জ্যোতিষ তো আগাগোড়া ভুল, জন্মক্ষণ ঠিক করেই বা কি হবে? যে আসছে সে তোমার কথা শুনবে না, ডাক্তারের বাধাও মানবে না, নিজের মর্জিতে যথাকালে বেরিয়ে আসবে। আর, ছেলে হবে তাই বা ধরে নিচ্ছ কেন?

—নির্ঘাত ছেলে হবে। আমি সোমনাথের বউএর কররেখা দেখেছি, তা ছাড়া খনার ফরমুলা কষে ভাগশেষ এক পেয়েছি—একে সুত দুইএ সুতা, তিন হইলে গর্ভ মিথ্যা।

সোমনাথ হঠাৎ ছুটে এসে মাথার চুল টেনে বলল, ওঃ, আর তো যন্ত্রণা দেখতে পারি না। কি পাপই করেছি, আমার জন্যেই এত কষ্ট পাচ্ছে।

সোমনাথের ভগিনীপতি পাঁচুবাবু বললেন, তোমার মুণ্ডু। পাপ কিছু কর নি, মানবধর্ম পালন করেছ, বউকে শ্রেষ্ঠ উপহার দিয়েছ। না দিলে চিরকাল গঞ্জনা খেতে। তবে হাঁ, যদি তাকে তিন বারের বেশী আঁতুড় ঘরে পাঠাও তবে তোমাকে বর্বর স্বার্থপর সমাজদ্রোহী বলব। কুইন ভিক্‌টোরিয়ার যুগ আর নেই, গণ্ডা গণ্ডা সন্তানের জন্ম দিলে দেশের লোক কৃতার্থ হবে না।

পণ্ডিত হরিবিষ্ণু সত্যার্থী বললেন, ওহে সোমনাথ, বউমাকে জম্ভলার নাম নিতে বল। অস্তি গোদাবরীতীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী, তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ গর্ভিণী বিশল্যা ভবেৎ। অর্থাৎ গোদাবরীর তীরে জম্ভলা রাক্ষসী থাকে, তার নাম স্মরণ করলেই গর্ভিণীর যন্ত্রণা দূর হয়ে সুপ্রসব হয়।

তারক জ্যোতিষী বলল, এখন নয়, আটটা বেজে তিন মিনিটের সময় জম্ভলার নাম নিতে বলবেন। কাল সকালেই আমি কোষ্ঠী গণনায় লেগে যাব, প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্য সিদ্ধান্ত, ভৃগু আর জ্যাডকিল, দুটোরই সমন্বয় করব, প্রাচীন নবগ্রহ আর আধুনিক ইউরেনস নেপচুন প্লুটো কিছুই বাদ দেব না। দেখে নেবেন আমার ভবিষ্যৎ গণনা কি রকম নির্ভুল হবে।

পাঁচুবাবু বললেন, ভবিষ্যৎ তো পরের কথা, সন্তানের বর্তমান হালচাল কিছু বলতে পার?

—না, বর্তমান আমার গণ্ডির বাইরে, আমার কারবার শুধু ভবিষ্যৎ নিয়ে।

হরিবিষ্ণু সত্যার্থী বললেন, গীতায় আছে, জীবের শুধু মধ্য অবস্থা অর্থাৎ জীবিতাবস্থাই আমরা জানতে পারি, তার পূর্বে কি ছিল এবং মরণের পরে কি হবে তা অব্যক্ত। সোমনাথের সন্তান এখন অতীত আর বর্তমানের সন্ধিক্ষণে রয়েছে। এ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে

যা আছে বলছি শুনুন। পরলোকবাসী মানবাত্মার পাপপুণ্যের ফলভোগ যখন সমাপ্ত হয় তখন সে মর্ত্যলোকে পতিত হয় এবং মেঘে প্রবেশ করে জলময় রূপ পায়। সেই জল বৃষ্টি রূপে পত্র পুষ্প ফল মূল ওষধি বনস্পতিতে সঞ্চারিত হয় এবং তা ভক্ষণের ফলে নরনারীর দেহে শুক্র ও শোণিত উৎপন্ন হয়। গর্ভাধানকালে শুক্রের আধিক্যে পুরুষ, শোণিতের আধিক্যে স্ত্রী, এবং উভয়ের সমতায় ক্লীবের সৃষ্টি হয়। জরায়ুমধ্যস্থ ভ্রূণ প্রথম দিনে পঙ্কতুল্য, পাঁচ দিনে বুদ্‌বুদ, সাত দিনে পেশী, এক পক্ষে অর্বুদ, পঁচিশ দিনে ঘন, এবং এক মাসে কঠিন আকার পায়। দুই মাসে মস্তক, তিন মাসে গ্রীবা, চার মাসে ত্বক, পাঁচ মাসে নখ ও রোম, ছ মাসে চক্ষু কর্ণ নাসা আর মুখের সৃষ্টি হয়। সপ্তম মাসে ভ্রূণ স্পন্দিত হয়, অষ্টম মাসে বুদ্ধি যোগ হয়, এবং নবম মাসে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণতা পায়। জন্মের পরেই শিশুর অনুভূতি হয়। তার পর সে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, প্রাক্তন কর্ম অনুসারে সংসারে সুখদুঃখ ভোগ করে, এবং মৃত্যুর পরে পুনর্বার দেহান্তর পায়।

পাঁচুবাবু বললেন, ওহে প্রফেসর অনাদি, তোমাদের শাস্ত্রে কি বলে?

বায়োলজিস্ট অনাদি রায় বললেন, সত্যার্থী মশায় নেহাত মন্দ বলেন নি। আমরা যা জানি তা বলছি শুনুন। প্রথমে দুটি অতি ক্ষুদ্র কোষের সংযোগ, তা থেকে ক্রমশ অসংখ্য কোষের উৎপত্তি, তারই পরিণাম এই মানবদেহ। প্রথম কয়েক মাস ভ্রূণকে মানুষ বলে চেনা যায় না, মনে হয় মাছ টিকটিকি বা বেরাল-ছানা। কোটি কোটি বৎসরে মানুষের যে ক্রমিক রূপান্তর হয়েছে, জরায়ুস্থ ভ্রূণ যেন তারই পুনরভিনয় করে। চার-পাঁচ মাসে তার চেহারা মানুষের মতন হয়, সে হাত-পা নাড়ে, মাঝে মাঝে মাথা দিয়ে গর্ভধারিণীকে গুঁতো মারে,

হয়তো আঙুলও চোষে। গর্ভবাসকালে সে শ্বাস নেয় না, কিন্তু দেড় মাসের হলেই ভ্রূণের বুক ধুকধুক করতে থাকে। পুষ্টির জন্যে যা দরকার সবই তার মায়ের রক্ত থেকে ফুল বা প্লাসেণ্টার মধ্যে ফিলটার হয়ে গর্ভনাড়ী দিয়ে ভ্রূণের দেহে প্রবেশ করে। জরায়ুস্থ তরল পদার্থের মধ্যে সে যেন জলচর প্রাণী রূপে বাস করছিল, ভূমিষ্ঠ হয়েই সে হঠাৎ স্থলচর হয়ে যায়। দু-এক মিনিটের মধ্যেই সে শ্বাস নেবার চেষ্টা করে, খাবি খেয়ে কেঁদে ওঠে, নাক মুখ দিয়ে লালা বার করে ফেলে। নবজাত মনুষ্যশাবক লম্বায় এক হাতের কম, ওজনে প্রায় সাড়ে তিন সের, মাথা বড়, পেট লম্বা, হাত-পা ছোট ছোট। মা বাপ ভাই বোনের সঙ্গে তার চেহারার যতই মিল থাকুক, সে একজন স্বতন্ত্র অদ্বিতীয় মানুষ। প্রথম কয়েক মাস সে সমবয়সী ছাগল-ছানার চাইতেও অসহায়, কিন্তু তার পর তার শক্তি আর বুদ্ধি ক্রমশ বাড়তে থাকে।

হরিবিষ্ণু সত্যার্থী বললেন, অনাদিবাবু শুধু স্থূল দেহের উৎপত্তির বিবরণ দিলেন, কিন্তু মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার আর আত্মার কথা তো বললেন না।

অনাদি রায় বললেন, ও সব কিছুই জানি না সত্যার্থী মশায়, বলব কি করে?

সোমনাথ কান খাড়া করে ছিল, হঠাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদ শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল। তারক সান্যাল তার হাতঘড়িতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইল। আর সকলে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তার পর হঠাৎ আওয়াজ এল—ওয়াঁ ওয়াঁ।

তারক জ্যোতিষী বলল, আটটা বেজে তিন মিনিট, আহাহা, আর দু মিনিট পরে হলেই খাসা হত। যাই হক, আমার গণনায় ভুল হয় নি, পুত্র সন্তানই হয়েছে।

ভুজঙ্গ ভঞ্জ বলল, তা তুমি জানলে কি করে?

—ওই যে, হুলো বেরালের মতন ডেকে উঠল। মেয়ে হলে উয়াঁ উয়াঁ করত।

কবি শ্রীকণ্ঠ নন্দী এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন। এখন বললেন, তারকবাবুর কথা ঠিক। কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে লিখেছেন, জনক রাজা লাঙল চালাতে চালাতে হঠাৎ দেখলেন, মাটির ডেলা থেকে ছোট্ট একটি মেয়ে বেরিয়েছে, 'উঙা উঙা করি কাঁদে যেন সৌদামিনী।'

ভুজঙ্গ ভঞ্জ বলল, তারকের মতন গুনে বলতে সবাই পারে। হয় ছেলে না হয় মেয়ে, এই দুটোর মধ্যে একটা যদি বাই চান্স মিলে যায় তাতে বাহাদুরিটা কি?

সোমনাথের ভাগনী তোতা শাঁখ বাজাতে বাজাতে এসে বলল, মামীর খোকা হয়েছে, এই অ্যাত্তো বড়, গোলাপ ফুলের মতন লাল টুকটুকে।

পাঁচুবাবু বললেন, লাল টুকটুকে রঙ এক মাসের মধ্যেই নবঘনশ্যাম হয়ে যাবে। তোর মামা কি করছে রে?

—নর্স বলছে চলে যেতে, কিন্তু মামা ঘর থেকে নড়বে না, খালি খালি ছেলের দিকে চেয়ে আছে।

—হুঁ। প্রথম যখন ছেলে হল ভাবলুম বাহা বাহা রে। সোমনাথের সেই দশা হয়েছে। আর দেরি করে কি হবে, আমাদের আশীর্বাদটা এখনই সেরে ফেলা যাক। সোমনাথকে ডাকবার দরকার নেই, পরে জানিয়ে দিলেই চলবে। সে এখন পুত্রের চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ করতে থাকুক। সত্যার্থী মশায়, আপনিই আরম্ভ করুন।

গলায় খাঁকার দিয়ে হরিবিষ্ণু সত্যার্থী স্বর করে বলতে লাগলেন—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসংবিৎসুখসাগরেঽস্মিন্
লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥

এই নবকুমার স্বাস্থ্যবান বিদ্যাবান ধর্মপ্রাণ হয়ে বেঁচে থাকুক, পরম জ্ঞান লাভ করুক, পরব্রহ্ম রূপ অপারসংবিৎসুখসাগরে তার চিত্ত লীন হক, তাতেই তার কুল পবিত্র হবে, জননী কৃতার্থা হবেন, বসুন্ধরা পুণ্যবতী হবেন। এর চাইতে বড় আশীর্বাদ আমার জানা নেই।

পাঁচুবাবু হাত নেড়ে বললেন, এ কি রকম বেয়াড়া আশীর্বাদ করলেন সত্যার্থী মশায়! সোমনাথের ছেলের চিত্ত যদি পরব্রহ্মে লীন হয়ে যায় তবে তার আর রইল কি? ওর বাপ মা আত্মীয় স্বজন যে মহা ফেসাদে পড়বে।

হরিবিষ্ণু সত্যার্থী বললেন, বেশ তো, আপনি নিজের মনের মতন একটি আশীর্বাদ করুন না।

পাঁচুবাবু বললেন, শুনুন। আশীর্বাদ করি, এই ছেলে সুস্থ দেহে দিন দিন বাড়তে থাকুক, বেশী অসুখে ভুগে যেন বাপ-মাকে না জ্বালায়। সুন্দর সবল খোকা হয়ে বালগোপালের মতন উপদ্রব করুক, যথাকালে লেখাপড়া শিখুক, ভাল রোজগার করুক, প্রেমে পড়ে বিয়ে করুক কিংবা বিয়ে করে প্রেমে পড়ুক। সে তেজস্বী বীরপুরুষ হক। গুন্ডা হতে বলছি না, কিন্তু এক চড়ের বদলে তিন চড় যেন ফিরিয়ে দিতে পারে। দরকার হলে সে যেন দেশের জন্যে লড়তে পারে, উড়তে পারে, জাহাজ চালাতে পারে। সে যেন অলস বিলাসী হুজুগে না হয়, নাচ গান আর সিনেমা নিয়ে না মাতে, চোর ঘুষখোর মাতাল

লম্পট না হয়। বহু লোককে সে প্রতিপালন করুক, প্রচুর উপার্জন করে জনহিতার্থে ব্যয় করুক, কিন্তু বেশী টাকা জমিয়ে রেখে যেন বংশধরদের মাথা না খায়। তার অসংখ্য বন্ধু হক, গোটা কতক শত্রুও হক, নইলে সে আত্মগর্বী হয়ে পড়বে। সে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ যত খুশি চর্চা করুক, কিন্তু যেন বুদ্ধ যিশু শংকর আর শ্রীচৈতন্যের মতন সংসারত্যাগী না হয়। তার মহাপুরুষ পরমপুরুষ বা অবতার হবার কিছুমাত্র দরকার নেই। তবে হাঁ, বঙ্কিমচন্দ্র কাটছাঁট করে যে রকম bowdlerized নির্দোষ সর্বগুণান্বিত আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ খাড়া করেছেন সে রকম যদি হতে পারে তাতে আমাদের আপত্তি নেই। মোট কথা, আমরা চাই সোমনাথের ব্যাটা একজন মান্য গণ্য স্বনামধন্য চৌকশ পরিপূর্ণ পুংপুরুষ হয়ে উঠুক, যাকে বলে hundred per cent he-man.

ভুজঙ্গ ভঞ্জ বলল, পাঁচু-দা ভালই বলেছেন, তবে ওঁর আশীর্বাদে বুর্জোআ ভাব প্রকট হয়েছে। প্রজার ভাগ্য আর রাষ্ট্রের ভাগ্য এক সঙ্গে জড়িত, রাষ্ট্রের সংস্কার না হলে প্রজার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হতে পারে না। অতএব রাষ্ট্র আর প্রজা দুইএরই মঙ্গলকামনায় আমি বলছি—এই সদ্যোজাত ভারতসন্তান যেন এমন শাসনতন্ত্রের আশ্রয় পায় যা তাকে সর্বাত্মক শিক্ষা দেবে, তার সামর্থ্যের উপযুক্ত কর্ম দেবে, তার প্রয়োজনের উপযুক্ত জীবিকার ব্যবস্থা করবে, সে যেন কায়মনোবাক্যে রাষ্ট্রবিধির বশবর্তী হয়, তার চিত্ত পরব্রহ্মে লীন না হয়ে যেন রাষ্ট্রেই লীন হয়। সে যেন বোঝে, সে রাষ্ট্রেরই একটি অবয়ব, হাত পা প্রভৃতির মতন সেও এক বিরাট মস্তিষ্কের অধীন, তার স্বাতন্ত্র্য নেই।

পাঁচুবাবু বললেন, তুমি বলতে চাও এই শিশু রাষ্ট্রদাস হয়ে জন্মেছে, চিরকাল রাষ্ট্রদাস হয়েই থাকবে। তার নিজের মতে চলবার

বা আপত্তি জানাবার অধিকার নেই, যত অধিকার শুধু রাষ্ট্রের বিরাট মস্তিষ্ক অর্থাৎ চাঁইদেরই আছে। ও সব চলবে না বাপু, সোমনাথের অপত্য কর্তাভজা হয়ে কলের পুতুলের মতন হাত পা নাড়বে কিংবা পিঁপড়ে মৌমাছির মতন বাঁধাধরা সংস্কারের বশ একঘেয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে তা আমরা চাই না। ওহে শ্রীকণ্ঠ কবি, তোমার কণ্ঠ নীরব কেন? তুমিও একটি আশীর্বাণী বল।

শ্রীকণ্ঠ নন্দী বললেন, বলবার অবসর পাচ্ছি কই? স্বর্গ থেকে একটি শিশু অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে আদর করে ঘরে তুলবেন, তা নয়, শুধু বায়োলজি ব্রহ্মনির্বাণ সমাজতত্ত্ব আর রাজনীতির কচকচি। আসুন, আমরা নবজাতককে অভিনন্দন জানাই, মহাত্মা কবীর যেমন তাঁর পুত্র কমালকে পেয়ে বলেছিলেন তেমনি সোমনাথের হয়ে আমরাও বলি—

অজব মুসাফির ঘর মে আয়া ধরো মংগল থাল,
উজ্জর বংস কবীর কা উপজে পুত কমাল।

—আশ্চর্য পথিক ঘরে এসেছে, মঙ্গল থাল ধরে তাকে বরণ কর; কবীরের বংশ উজ্জ্বল হল, পুত্র কমাল জন্মেছে। অথবা টেনিসনের মতন উদাত্ত কণ্ঠে সম্ভাষণ করুন—

Out of the deep, my child, out of the deep,
From that great deep, before our world begins,
Whereon the spirit of God moves as he will . . .
From that true world within the world we see,
Whereof our world is but the bounding shore . . .
With this ninth moon, that sends the hidden sun
Down yon dark sea, thou comest, darling boy.

কিংবা রবীন্দ্রনাথের মতন বলুন—

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্য কালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী।
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস আনন্দস্রোতে—

গরুচোরের মতন সলজ্জ মুখে সোমনাথ ঘরে এসে বলল, চা করতে বলি? তার সঙ্গে কচুরি আর রসগোল্লা?

পাঁচুবাবু বললেন, রাম বল। তোমার তো এখন জাতাশৌচ, এ বাড়ির কোনও জিনিস আমাদের খাওয়া চলবে না, কি বলেন সত্যার্থী মশায়? এক মাস কাটুক, তোমার বউ চাঙ্গা হয়ে উঠুক, তার পর খোকাকে কোলে নিয়ে আমাদের যত ইচ্ছে হয় পরিবেশন করবে।

তোতা বলল, বা রে, খোকাকে কোলে নিয়ে বুঝি পরিবেশন করা যায়!

—আচ্ছা আচ্ছা, খোকা না হয় তোর মামার কোলে থাকবে।

—আর যদি মামার—

—তা হলে তোর মামার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে।

চিঠি বাজি

সুকান্ত দত্ত অতি ভাল ছেলে, এম. এস-সি পাস করার কিছুদিন পরেই পি-এচ. ডি ডিগ্রী পেয়েছে। একটি ভাল চাকরি যোগাড় করে প্রায় বছরখানিক সিন্দ্রির সার-কারখানায় কাজ করছে। তার বাপ-মা নেই, মামাই তাকে মানুষ করেছেন।

আজ সকালের ডাকে মামার কাছ থেকে সুকান্ত একটা চিঠি পেয়েছে। তিনি লিখেছেন—

সুকান্ত, তোমার বিবাহ স্থির করেছি, বিজয়লক্ষ্মী কটন মিলের কর্তা বিজয় ঘোষের মেয়ে সুনন্দার সঙ্গে। বনেদী বংশ, বিজয়বাবু আমাদের কাছাকাছি শাঁখারীপাড়াতে থাকেন। মেয়েটি সুশ্রী, খুব ফরসা, বি. এস-সি পাস করতে পারে নি, তবে বেশ চালাক। ফোটো পাঠালুম। তোমারই উচিত ছিল নিজে দেখে পাত্রী পছন্দ করা, কিন্তু একালের ছেলে হয়ে কেন যে তুমি আমার উপর ভার দিলে তা বুঝতে পারি না। যাই হক, আমি যথাসাধ্য দেখে শুনে এই পাত্রী স্থির করেছি, আশা করি তোমারও পছন্দ হবে। তেইশে ফাল্‌গুন বিবাহ, পাঁচ সপ্তাহ পরেই। তুমি এখন থেকে চেষ্টা কর যাতে পনরো দিনের ছুটি পাও। বিবাহের অন্তত দুদিন আগে তোমার আসা চাই।

সুকান্ত মামার চিঠিটা মন দিয়ে পড়ল, ফোটোটাও ভাল করে দেখল। কিছুক্ষণ ভেবে সে তার রঙের বাক্স থেকে তিন-চার রকম রঙ নিয়ে এক টুকরো কাগজে লাগাল এবং নিজের বাঁ হাতের

কবজির উপর কাগজখানা রেখে বার বার দেখল তার গায়ের রঙের সঙ্গে মিল হয়েছে কিনা। তার পর আরও খানিকক্ষণ ভেবে এই চিঠি লিখল—

শ্রীযুক্তা সুনন্দা ঘোষ সমীপে। আমার সঙ্গে আপনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। মামাবাবুর চিঠিতে জানলুম আপনি খুব ফরসা। আমার রঙ কিন্তু খুব ময়লা। হয়তো আপনি শুনেছেন শ্যামবর্ণ, কিন্তু তাতে অনেক রকম শেড বোঝায়। আমার গায়ের রঙ ঠিক কি রকম তা আপনাকে জানানো কর্তব্য মনে করি, সেজন্যে এক টুকরো কাগজে রঙ লাগিয়ে পাঠাচ্ছি, আমার বাঁ হাতের কবজির উপর পিঠের সঙ্গে মিল আছে। এই রকম গাঢ় শ্যামবর্ণ স্বামীতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে তবে দয়া করে এক লাইন লিখবেন—আপত্তি নেই। আমার ঠিকানা লেখা খাম পাঠালুম। যদি আপত্তি থাকে তবে চিঠি লেখবার দরকার নেই। পাঁচ দিনের মধ্যে আপনার উত্তর না পেলে বুঝব আপনি নারাজ। সে ক্ষেত্রে আমি মামাবাবুকে জানাব যে এই সম্বন্ধ আমার পছন্দ নয়, অন্য পাত্রী দেখা হক। ইতি। সুকান্ত।

চার দিন পরে উত্তর এল।—ডক্টর সুকান্ত দত্ত সমীপে। আপত্তি নেই। কিন্তু প্রকৃত খবর আপনি পান নি, আমার গায়ের রঙ আপনার চাইতে ময়লা, কনে দেখাবার সময় আমাকে পেণ্ট করে আপনার মামাবাবুকে ঠকানো হয়েছিল। কিন্তু আপনার মতন সত্যবাদী ভদ্রলোককে আমি ঠকাতে চাই না। আমার কাছে ছবি আঁকবার রঙ নেই। আপনি যে নমুনা পাঠিয়েছেন সেই কাগজ থেকে এক টুকরো কেটে তার উপর একটু ব্লুব্ল্যাক কালি লাগিয়ে আমার হাতের রঙের সমান করে পাঠালুম।

পুরুষের কালো রঙে কেউ দোষ ধরে না, কিন্তু সবাই ফরসা মেয়ে খোঁজে, যে জোঁক-কালো সেও অপ্সরী বিদ্যাধরী বউ চায়। আপনি সংকোচ করবেন না, আমার কালো রঙে আপত্তি থাকলে সম্বন্ধ বাতিল করে দেবেন। আর আপত্তি না থাকলে দয়া করে পাঁচ দিনের মধ্যে এক লাইন লিখে জানাবেন। ইতি। সুনন্দা।

চিঠি পেয়েই সুকান্ত উত্তর লিখল।— আপনার রঙ আমার চাইতে এক পোঁচ বেশী ময়লা হলেও আমার আপত্তি নেই। তবে সত্য কথা বলব। প্রথমটা মন খুঁতখুঁত করেছিল, কারণ সুন্দরী বউ একটা সম্পদ, স্বামীর গৌরব আর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু পরেই মনে হল, এ রকম ভাবা নিতান্ত মূর্খতা। ফোটো দেখে বুঝেছি আপনার সৌষ্ঠবের অভাব নেই, তাই যথেষ্ট। রঙ ময়লা হলেই মানুষ কুৎসিত হয় না।

আমার একটা কদভ্যাস আছে, জানানো উচিত মনে করি। রোজ পনরো-কুড়িটা সিগারেট খাই। আমার এক বউদিদি বলেন, সিগারেট-খোরদের নিশ্বাসে একটা বিশ্রী মুখপোড়া গন্ধ হয়, তাদের বউরা তা পছন্দ করে না, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় কিছু বলতে পারে না। দু-চারটে বাঙালীর মেয়ে যারা মেমদের দেখাদেখি সিগারেট ধরেছে তাদের অবশ্য আপত্তি হতে পারে না, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই সে দলের নন। আপনার আপত্তি থাকলে এক লাইন লিখে জানাবেন, আমি সম্বন্ধ বাতিল করে দেব। ইতি। সুকান্ত।

চার দিন পরে সুনন্দার উত্তর এল।—মুখপোড়া গন্ধে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু শুনেছি সিগারেট খেলে নাকি ক্যানসার হয়। আপনি ওটা ছেড়ে দিয়ে হুঁকো ধরুন না কেন? তার গন্ধেও আমার

আপত্তি নেই। আমারও একটা বিশ্রী অভ্যাস আছে, রোজ বিশ-পঁচিশ খিলি পান আর দোক্তা খাই। দাঁতের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। যারা পান-দোক্তা খায় তাদের নিশ্বাসে নাকি অ্যামোনিয়ার গন্ধ থাকে। আমার ছোট ভাই লম্বুর নাক অত্যন্ত সেনসিটিভ, কুকুরের চাইতেও। রেডিওতে যখন কৃষ্ণসোহাগিনী দেবীর কীর্তন হয় তখন লম্বু অ্যামোনিয়ার গন্ধ পায়। আবার গ্রামোফোনে যখন ওস্তাদ বড়ে গোলাম মওলার দরবারী কানাড়ার রেকর্ড বাজে তখন লম্বু রশুনের গন্ধ পায়। আমার কদভ্যাসে আপনার আপত্তি না থাকলে এক লাইন লিখে জানাবেন, নতুবা সম্বন্ধ ভেঙে দেবেন। ইতি। সুনন্দা।

সুকান্ত উত্তর লিখল।—আপনি যখন সিগারেটের দুর্গন্ধ সইতে রাজী আছেন তখন আপনার পান-দোক্তায় আমার আপত্তি নেই। তা ছাড়া আমাদের এই কারখানায় অজস্র অ্যামোনিয়া তৈরি হয়, তার ঝাঁজ আমার সয়ে গেছে। আপনার হুঁকোর প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখব।

কোনও বিষয়ে আমি আপনাকে ঠকাতে চাই না, সেজন্যে আমার আর একটি ত্রুটি আপনাকে জানাচ্ছি। পুরুষরা যেমন অনন্যপূর্বা পত্নী চায়, মেয়েরাও তেমনি এমন স্বামী চায় যে পূর্বে কখনও প্রেমে পড়ে নি। আমি স্বীকার করছি আমি অক্ষতহৃদয় নই। ডেপুটি কমিশনার লালা তোপচাঁদ ঝোপড়ার মেয়ে সুরঙ্গীর সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছিল। তার বাপ মায়ের তেমন আপত্তি ছিল না, কিন্তু শেষটায় সুরঙ্গীই বিগড়ে গেল। সম্প্রতি সে কমার্স ডিপার্টমেণ্টের মিস্টার হনুমন্থিয়াকে বিয়ে করেছে। লোকটা মিশ কালো, যমদূতের মতন গড়ন, তবে মাইনে আমার প্রায় তিন গুণ। আমার হৃদয়ের ক্ষত এখন অনেকটা সেরে গেছে, আপনার সঙ্গে বিবাহের পর

একেবারে বেমালুম হবে আশা করি। সুরঙ্গীর একটা ফোটো আমার কাছে আছে, আপনার সামনেই সেটা পুড়িয়ে ফেলব।

সুরঙ্গীর বিবাহ হয়ে যাবার পরে আমার খেয়াল হল যে আমারও শীঘ্র বিবাহ হওয়া দরকার। অবসরকালে আমি ছবি আঁকি, ফোটো তুলি, নানারকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করি। গৃহস্থালির ঝঞ্ঝাট পোহানোর জন্যে একজন গৃহিণী থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের শখ নিয়ে অবসরযাপন করতে পারি। এখন আমার জ্ঞান হয়েছে, হঠাৎ প্রেমে পড়া বোকামি, একত্র বাস করার ফলে একটু একটু করে স্ত্রী-পুরুষের যে ভালবাসা জন্মায় তাই খাঁটী জিনিস। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে তাকে তো দেখবার উপায় নেই, তথাপি মা বাপের স্নেহের অভাব হয় না। সেই রকম বিবাহের আগে পাত্রী না দেখলেও কিছুমাত্র ক্ষতি নেই। সেজন্যেই মামাবাবুর উপর সব ছেড়ে দিয়েছি।

আমার স্বভাব চরিত্র মতামত সবই আপনাকে জানালুম। আপত্তি না থাকলে একটু খবর দেবেন। ইতি সুকান্ত।

সুনন্দার উত্তর এল।—আপনার স্বভাব চরিত্র আর মতামতে আমার আপত্তি নেই। যেসব চিঠি লিখেছেন তা থেকে বুঝেছি আপনি অতি সত্যনিষ্ঠ অকপট সাধুপুরুষ। অতএব আমিও অকপটে আমার গ্লদ জানাচ্ছি। পবনকুমার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ত, তার সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছিল। কিন্তু সে ভাদুড়ী ব্রাহ্মণ, তার সেকেলে গোঁড়া বাপ-মা আমাকে পুত্রবধূ করতে মোটেই রাজী হলেন না। পবন এখন ব্যাংগালোরে আছে, খুব একটা বড় পোস্ট পেয়েছে। তাকে পুরো ভুলতে পারি নি, তবে আপনার মতন মহাপ্রাণ স্বামী পেলে একদম ভুলে যাব তাতে সন্দেহ নেই। আমি বলি কি, সুরঙ্গী আর পবনের ফোটো পুড়িয়ে কি হবে, বরং একই ফ্রেমে দুটো ছবি

বাঁধিয়ে শোবার ঘরে টাঙিয়ে রাখা যাবে। তাতে বিষে বিষক্ষয় হবে, কি বলেন? আপনার অভিপ্রায় জানাবেন। ইতি। সুনন্দা।

সুকান্ত উত্তর লিখল।—সুনন্দা, তোমাকে আজ নাম ধরে সম্বোধন করছি, কারণ আমাদের দুজনের মধ্যে এখন আর কোনও লুকোচুরি রইল না, বিবাহের বাধাও কিছু নেই। লোকে বলে আমি একটু বেশী গম্ভীর প্রকৃতির লোক। শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা অধিকন্তু বলে আমি একটু বোকা। তোমার চিঠি পড়ে বুঝেছি তুমি আমুদে মানুষ, আর মামাবাবুর চিঠিতে জেনেছি বি. এস-সি ফেল হলেও তুমি বেশ চালাক। মনে হচ্ছে তোমার আর আমার স্বভাব পরস্পরের পূরক অর্থাৎ কমপ্লিমেণ্টারি। সাইকোলজিস্টদের মতে এই হল আসল রাজযোটক, আদর্শ দম্পতির লক্ষণ। আজ ষোলই ফাল্‌গুন, সাত দিন পরেই আমাদের বিবাহ। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপের আনন্দ এখনই কল্পনায় উপভোগ করছি। তোমার সুকান্ত।

কিছুদিন পরে সুনন্দার চিঠি এল।—যাঃ, সব ভেস্তে গেল, এমন মুশকিলেও মানুষে পড়ে! পবন ভাদুড়ী এখানে এসেছে। কাল আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, দেখ সুনন্দা, এখন আমি স্বাধীন, ভাল রোজগার করি, বাপ মায়ের বশে চলবার কোনও দরকার নেই। তুমি আমার সঙ্গে চল, ব্যাংগালোরে সিভিল বা হিন্দু ম্যারেজ যা চাও তাই হবে।

এই তো পরিস্থিতি। আমার অবস্থাটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। পবন ভাদুড়ীকে হাঁকিয়ে দেওয়া আমার সাধ্য নয়, কালই অর্থাৎ আপনার নির্ধারিত বিবাহের দু দিন আগেই পবনের সঙ্গে আমি পালাচ্ছি। কিন্তু আপনার প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে,

আপনার ব্যবস্থা না করে আমি যাচ্ছি না। আমার বোন নন্দা আমার চাইতে দেড় বছরের ছোট। দেখতে আমারই মতন, তবে রঙ বেশ ফরসা। সেও বি. এস-সি ফেল। ঝকঝকে দাঁত, পান দোক্তা খায় না, এ পর্যন্ত প্রেমেও পড়ে নি। আপনার সব চিঠিই সে পড়েছে, পড়ে ভীষণ মোহিত হয়েছে। আপনাকে বিয়ে করবার জন্যে মুখিয়ে আছে। ডক্টর সুকান্ত, দোহাই আপনার, কোনও হাঙ্গামা বাধাবেন না, বাড়ির কাকেও কিছু বলবেন না। আপনাদের প্রোগ্রাম অনুসারে বরযাত্রী নিয়ে যথাকালে আমাদের বাড়িতে আসবেন, পুরুত যে মন্ত্র পড়াবে সুবোধ বালকের মতন তাই পড়বেন, আমার বাবা নন্দাকেই আপনার হাতে সম্প্রদান করবেন। তাকে পেয়ে নিশ্চয় আপনি সুখী হবেন। আপনি তো গৃহস্থালি দেখবার জন্যে একটি গৃহিণী চান, সুতরাং সুনন্দার বদলে নন্দাকে পেলেও আপনার চলবে। নিজের বোনের প্রশংসা করা ভাল দেখায় না, নয়তো চুটিয়ে লিখতুম নন্দা কি রকম চমৎকার মেয়ে। আজ বিদায়, এর পর সুযোগ পেলে আপনার সঙ্গে দেখা করে আমি ক্ষমা চাইব। ইতি। সুনন্দা।

সুনন্দার চিঠি পড়ে সুকান্ত হতভম্ব হল, খুব রেগেও গেল। কিন্তু সে যুক্তিবাদী র‍্যাশনাল লোক। একটু পরেই বুঝে দেখল, সুনন্দার প্রস্তাব মন্দ নয়, গৃহিণীই যখন দরকার তখন এক পাত্রীর বদলে আর এক পাত্রী হলে ক্ষতি কি। সুকান্ত স্থির করল সে হাঙ্গামা বাধাবে না, কোনও রকম খোঁজও করবে না, সম্পূর্ণভাবে মামার বশে চলবে, তিনি যেমন ব্যবস্থা করবেন তাই মেনে নেবে।

সুকান্ত কলকাতায় এলে তার মামার বাড়ির কেউ সুনন্দা সম্বন্ধে কিছুই বলল না, কোনও রকম উদ্বেগও প্রকাশ করল না। যথাকালে

বরযাত্রীদের সঙ্গে সুকান্ত বিয়েবাড়িতে উপস্থিত হল। সেখানেও গোলযোগের কোনও লক্ষণ তার নজরে পড়ল না।

সুকান্ত দেখল, ষোল-সতরো বছরের একটি ছেলে নিমন্ত্রিতদের পান আর সিগারেট পরিবেশন করছে, কন্যাপক্ষের লোকে তাকে লম্বু বলে ডাকছে। তাকে ইশারা করে কাছে ডেকে সুকান্ত চুপি চুপি প্রশ্ন করল, তুমি সুনন্দার ছোট ভাই লম্বু?

লম্বু বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এদিকের খবর কি?

—খবর সব ভালই। দিদিকে এখন সাজানো হচ্ছে, একটু পরেই তো বিয়ের লগ্ন।

—সুনন্দা চলে গেছে?

—কি বলছেন আপনি, বিয়ের কনে কোথায় চলে যাবে?

—তোমার আর এক দিদি নন্দা, তার খবর কি?

—বা রে! আমার তো একটি দিদি, তার সঙ্গেই তো আপনার বিয়ে হচ্ছে।

সুকান্ত চোখ কপালে তুলে বলল, ও!

রাত বারোটার পরে বাসরঘরে অন্য কেউ রইল না। সুকান্ত জিজ্ঞাসা করল, তুমি সুনন্দা না নন্দা?

—দুইই। পোশাকী নাম সুনন্দা, আটপৌরে ডাকনাম নন্দা।

—চিঠিতে অত সব মিছে কথা লিখলে কেন?

—কোনও কুমতলব ছিল না। সত্যবাদী উদারচরিত ভাবী বরকে একটু বাজিয়ে দেখছিলুম সইবার শক্তি কতটা আছে।

—তোমার সেই পবননন্দন ভাদুড়ীর খবর কি?

—হাওয়া হয়ে উবে গেছে, তার অস্তিত্বই নেই। আমার কাছে একটি হনুমানজীর ভাল ছবি আছে, তোমার সেই সুরঙ্গীর ফোটোর সঙ্গে বাঁধিয়ে রাখলে বেশ হবে না?

—তুমি একটি ভীষণ বকাটে মেয়ে। সেইজন্যেই বি. এস-সিতে ফেল করেছ।

—ঝুনি মিত্তির আমার ডবল বকাটে, সে ফার্স্ট হল কি করে? আমি অঙ্কে কাঁচা, ম্যাক্সওয়েলের থিওরিটা মোটেই বুঝতে পারি না, আর ওইটেরই কোশ্চেন ছিল।

—কেন, ও তো খুব সোজা অঙ্ক। বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। ভি ইকোয়াল টু রুট ওভার ওআন বাই কাপ্পা মিউ—

—থাক থাক। বাসরঘরে অঙ্ক কষলে অকল্যাণ হয়।

—আচ্ছা, কাল বুঝিয়ে দেব।

—কাল তো কালরাত্রি, বর-কনের দেখা হবার জো নেই। সেই পরশু ফুলশয্যায় দেখা হবে।

—বেশ তো, তখন বুঝিয়ে দেব।

—ফুলশয্যায় অঙ্ক কষলে মহাপাতক হয় তা জান? ঠাকুমার আবার আড়িপাতা রোগ আছে, যদি শুনতে পান যে নাতজামাই ফুল-শয্যায় অঙ্ক কষছে তবে গোবর খাইয়ে প্রায়শ্চিত্ত করাবেন। তাড়া কিসের, আমি তো পালাচ্ছি না। বছরখানিক যাক, তার পর বুঝিয়ে দিও।

—আচ্ছা তাই হবে। এখন ঘুমনো যাক, কি বল? দেখ সুনন্দা, তুমি খাসা দেখতে।

—তাই নাকি? তোমার দৃষ্টি তো খুব তীক্ষ্ম।

—সুনন্দা, আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জান?

—আমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে?

—ঠিক তা নয়। মনে হচ্ছে—

—মনে হক গে, এখন ঘুমও।

সত্যসন্ধ বিনায়ক

বিনায়ক সামন্ত হাসপাতালে মারা গেছে। অখ্যাত হলেও সে অসামান্য, মহাত্মা গান্ধীর মতনই সে একগুঁয়ে সত্যাগ্রহী ছিল। তফাত এই—গান্ধীজী অবস্থা বুঝে রফা করতে পারতেন, কিন্তু বিনায়কের তেমন বুদ্ধি ছিল না। একজন অর্ধোন্মাদ নিজের খেয়ালে বা অন্যের প্ররোচনায় গান্ধীজীকে মেরেছিল। বিনায়ক মরেছে অসংখ্য লোকের দুর্নীতি আর নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে। তার মৃত্যুর জন্যে হয়তো আমরা সকলেই একটু আধটু দায়ী। আমরা বাধ্য হয়ে অনেক অন্যায় করে থাকি, আরও অনেক অন্যায় সয়ে থাকি, তারই পরিণাম বিনায়কের অপমৃত্যু। মরা ভিন্ন তার গত্যন্তর ছিল না, কারণ কাণ্ডজ্ঞানহীন নিষ্পাপ একগুঁয়ে কর্মবীরের জগতে স্থান নেই। কিছু পাপাচরণ না করলে এই পাপময় সংসারে জীবনধারণ অসম্ভব এই মোটা কথাটা বিনায়ক বুঝত না।

যারা তাকে চিনত তাদের সকলেরই বিশ্বাস যে বিনায়কের মাথায় বিলক্ষণ গোল ছিল, ঠিক পাগল না হলেও তাকে বাতিকগ্রস্ত বলা যায়। কিন্তু সে যে অত্যন্ত সাধু আর দেশপ্রেমী ছিল তাতে কারও সন্দেহ নেই। অল্প বয়সে সে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছিল, পরে স্বদেশী আর অসহযোগ নিয়ে মেতেছিল। তার পর একে একে কংগ্রেস কমিউনিস্ট প্রজা-সোস্যালিস্ট হিন্দুমহাসভা প্রভৃতি নানা দলে মিশে অবশেষে সে স্থির করেছিল, রাজনীতি অতি জঘন্য কুটিল পন্থা, সব দল ত্যাগ করে শুধু সত্যের শরণ নিতে হবে, প্রিয় বা অপ্রিয় যাই হক শুধু সত্যেরই ঘোষণা করতে হবে, তার পরিণাম কি দাঁড়াবে

ভাববার দরকার নেই। অর্থাৎ সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য, আর মা ফলেষু কদাচন—গীতার এই দুই মন্ত্রই সে মেনে নিয়েছিল।

বিনায়কের সঙ্গে অনেক কাল দেখা হয় নি, তার পর একদিন সে অদ্ভুত বেশে আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় উপস্থিত হল। পরনে ফিকে বেগনী রঙের ধুতি-পঞ্জাবি, কাঁধ থেকে একটা থলি ঝুলছে, তারও রঙ বেগনী। আমি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলুম, ব্যাপার কি বিনায়ক, এখন কোন্ পার্টিতে আছ? বাইরে একটি দঙ্গল দেখছি, ওরা তোমার চেলা নাকি?

বিনায়ক বলল, ওদের ভেতরে আসতে বলব? দশ জন আছে, আপনার এই তক্তপোশে জায়গা না হয় তো মেঝেতেই বসবে।

অনুমতি দিলে বিনায়কের সঙ্গীরা ঘরে এসে কতক তক্তপোশে কতক মেঝেতে বসে পড়ল। তাদের বয়স ষোল থেকে ত্রিশের মধ্যে, সকলেরই বেগনী সাজ আর কাঁধে ঝুলি। চায়ের ফরমাশ দিচ্ছিলুম, কিন্তু বিনায়ক বলল, আমরা নেশা করি না, চা সিগারেট পান কিছু না।

বললুম, খুব ভাল। এখন আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত কর। নতুন পার্টি বানিয়েছ দেখছি, নাম কি, উদ্দেশ্য কি, সব খোলসা করে বল।

বিনায়ক বলল, আমাদের দলের নাম সত্যসন্ধ সংঘ। উদ্দেশ্য, নির্ভয়ে সত্যের প্রচার। এই ইলেকশনে আমরা লড়ব।

—বল কি হে! তোমাদের পার্টির মেম্বার ক জন? টাকার জোর আছে? কংগ্রেস কমিউনিস্ট প্রজা-সোস্যালিস্ট হিন্দুমহাসভা এদের সঙ্গে লড়তে চাও কোন্ সাহসে? তোমাদের ভোট দেবে কে?

পরম ঘৃণায় মুখভঙ্গী করে বিনায়ক বলল, আমরা ইলেকশনে দাঁড়াব না, নিজের জন্যে বা বিশেষ কারও জন্যে ভোটও চাইব না।

আমাদের উদ্দেশ্য ভোটারদের হুঁশিয়ার করে দেওয়া, যাতে তারা ধূর্ত লোকের কথায় ভুলে অপাত্রে ভোট না দেয়।

—খুব সাধু সংকল্প। তোমাদের বেগনী সাজের মানে কি?

—বেগনী হচ্ছে সত্যের প্রতীক।

—এ যে নতুন কথা শোনাচ্ছ। সাদাই তো সত্যের রঙ।

—আজ্ঞে না। সাদা হচ্ছে সব চাইতে ভেজাল রঙ, সমস্ত রঙের খিচুড়ি, ফিজিক্স পড়ে দেখবেন। বুঝিয়ে দিচ্ছি শুনুন। কংগ্রেসের রঙ সাদা, কমিউনিস্টদের লাল, হিন্দুমহাসভার নারঙ্গী বা গেরুয়া। বৌদ্ধ জৈন শ্রমণদের রঙ হলদে, পাকিস্তানী পীরদের সবুজ, জাহাজী খালাসী আর মোটর মিস্ত্রীদের নীল, এবং মেটে হচ্ছে চাষা আর মজুরের রঙ। বাকী থাকে বেগনী, সব চেয়ে সূক্ষ্ম তরঙ্গের রঙ, তাই আমরা নিয়েছি। আমাদের ম্যানিফেস্টো পড়ছি, মন দিয়ে শুনুন।—

হে দেশের লোক, স্ত্রী পুরুষ যুবা বৃদ্ধ ধনী দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই, সাবধান সাবধান। যা বলছি আপনাদেরই মঙ্গলের জন্যে, আমাদের কিছুমাত্র স্বার্থ নেই। ইলেকশনে আপনারা অবশ্যই ভোট দেবেন, কিন্তু খবরদার, ফন্দিবাজ লোকের কথায় ভুলবেন না। যারা ভোট চাইবে তাদের সম্বন্ধে ভাল রকম খোঁজ নেবেন, কন্যাদানের পূর্বে ভাবী জামাই সম্বন্ধে যেমন খোঁজ নেন তার চাইতে ঢের বেশী খোঁজ ভোট দানের পূর্বে নেবেন। কারও উপরোধ শুনবেন না, বক্তৃতায় ভুলবেন না, খুব বিচার করে যোগ্যতম পাত্রকে ভোট দেবেন। কংগ্রেসী, প্রজাতন্ত্রী, কমিউনিস্ট, হিন্দুমহাসভিস্ট, ইত্যাদি হলেই লোকে ভাল হয় না, কোনও দলের মাতব্বর হলেই সে দেশের মঙ্গল করবে এমন কথা বিশ্বাস করবেন না। চোর ঘুষখোর কুচরিত্রকে ভোট দেবেন না, মাতাল গেঁজেল আফিমখোর লম্পট পরনারীসক্তকে ভোট

দেবেন না। যারা বলে—রাতারাতি তোমাদের সব দুঃখ দূর করব, বেকার কেউ থাকবে না, সকলেই কাজ পাবে, বাড়ি পাবে, মজুর আর চাষীদের রোজগার ডবল হবে, খাদ্য বস্ত্র সবাই সস্তায় পাবে, ট্যাক্স কমবে,—সেই ধাপ্পাবাজ মিথ্যাবাদীকে ভোট দেবেন না। যারা কোটিপতিদের বন্ধু, যাদের ছেলে জামাই ভাইপো কোটিপতিদের অফিসে চাকরি করে, যাদের ইলেকশনের খরচ কোটিপতিরা যোগায়, তারা ভোট চাইতে এলে দূর দূর করে হাঁকিয়ে দেবেন। যাদের প্ররোচনায় ছোট ছোট ছেলেরা ভোটের দালাল হয়ে পথে পথে চিৎকার করে, সেই শিশুমস্তকভক্ষকদের ভোট দেবেন না। যাদের নিজেদের বিচারের শক্তি নেই, বিদেশী প্রভুর হুকুমে ওঠে বসে, বিদেশী প্রভুর কোনও দোষই যারা দেখতে পায় না, সেই কর্তাভজাদের কথায় কান দেবেন না। যারা গরিব শিক্ষকদের জন্যে কুলী-মজুরদের চাইতে কম মাইনে বরাদ্দ করে, অথচ হোমরাচোমরা অফিসারদের তিন-চার হাজার দিতে আপত্তি করে না, সেই একচোখো স্নবদের ভোট দেবেন না। বড় বড় কুকর্মের তদন্তের জন্যে যারা কমিশন বসায় অথচ তদন্তের ফল চেপে রাখে, দুর্নীতির পোষক সেই কুটিল লোকদের ভোট দেবেন না। যারা খাদ্যে ভেজাল দেয়, কালোবাজার চালায়, ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, বিপন্ন ইসলাম আর বিপন্না গোমাতার দোহাই দেয়—

বাধা দিয়ে বললুম, হয়েছে হয়েছে, তোমার বক্তব্য বুঝেছি। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মতন লোকও তোমার টেস্টে ফেল করবেন। শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ একদম খাঁটী মানুষ পাবে কোথায়? শুকদেব গোস্বামী গৌতম বুদ্ধ আর চৈতন্য মহাপ্রভুর মতন লোক দিয়ে বজেট তৈরি হবে না, হরিণঘাটার দুধের ব্যবস্থাও হবে না। যারা কাজের লোক তাদের চরিত্রদোষ ধরলে চলে না। মাতাল আর লম্পট যদি অন্য বিষয়ে সাধু হয়, কোটিপতি যদি দাতা

হয়, একটু আধটু চোর হলেও কেউ যদি বুদ্ধিমান সুবক্তা জনহিতৈষী হয় তবে তাকে ভোট দিলে অন্যায় হবে না। সচ্চরিত্র বোবা গোবর-গণেশ দিয়ে দেশের কোন্ কাজ চলবে?

তক্তপোশে চাপড় মেরে বিনায়ক বলল, সব কাজ চলবে, সচ্চরিত্র খাঁটী লোক বিধানসভায় ঢুকে নিজের শক্তি দেখাবার সুযোগই এ পর্যন্ত পায় নি। দেশের লোক যদি হুঁশিয়ার হয়, অসাধু ধূর্তদের যদি ভোট না দেয়, তবেই ভাল লোক নির্বাচিত হবে এবং নিজের শক্তি দেখাবার সুযোগ পাবে।

—তোমাদের চলে কিং করে? আগে তো তুমি ঘুঘুডাঙা হাইস্কুলের মাষ্টার ছিলে, এখনও আছ নাকি?

—সে ইস্কুল থেকে আমাকে তাড়িয়েছে। এখন একটা কোচিং ক্লাস খুলেছি, এরাও ক জন তাতে পড়ায়। এই ভূপেশ জিতেন আর শৈলেনের বাপদের অবস্থা ভাল, এদের রোজগারের দরকার নেই। এই বিনয় মেয়েদের গান শেখায়, আর এই সুবল বদরিনাথ চৌধুরীর ফার্মে চাকরি করে।

—বল কি হে! ভেজাল ঘি বিক্রির জন্যে বদরিনাথ অনেক বার গ্রেপতার হয়েছে, বিস্তর ঘুষ আর তদবিরের জোরে প্রতি বার খালাস পেয়েছে।

—আপনি ঠিক জানেন?

—নিশ্চয়। আরে আমিই তো ওর উকিল ছিলুম।

বিনায়ক বলল, এই সুবল, তুই আজই কাজে ইস্তফা দিবি।

সুবল বলল, তা হলে খাব কি?

—দু দিন না খেলে মরবি না, চেষ্টা করে অন্য কোথাও কাজ জুটিয়ে নিবি।

আমি বললুম, ওহে বিনায়ক, তোমাদের সংকল্প অতি মহৎ তা তো বুঝলুম। আমাদের কাছে কি চাও বল।

—আপনাদের সব রকম সাহায্য চাই। প্রচারপত্র দিচ্ছি, চেনা লোকদের মধ্যে যত পারেন বিলি করবেন, সত্যসন্ধ সংঘের উদ্দেশ্যটি সকলকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন, আর আমাদের খরচের জন্য যথা-সাধ্য দান করবেন।

আমার বন্ধু হরিচরণবাবু বললেন, ভেরি সরি। আমাদের হচ্ছে পুঁটিমাছের প্রাণ, জলে বাস করি, হাঙর কুমির ঘড়েল রাঘব-বোয়াল সকলের সঙ্গেই সদ্‌ভাব রাখতে হবে।

আর এক বন্ধু কালীচরণ বললেন, ঠিক কথা। নিউট্রাল থাকাই আমাদের পক্ষে সব চেয়ে নিরাপদ পলিসি। কর্তৃত্ব যারাই পাক আমাদের তাতে কি। কংগ্রেসীরা এত দিন বেশ গুছিয়ে নিয়েছে, এখন না হয় অন্য দল কিছু লাভ করুক।

আর এক বন্ধু শিবচরণ বললেন, শুনুন বিনায়কবাবু। আপনারা যা করছেন তার নাম সিডিশন, ব্রিটিশ যুগে একেই বলা হত ওয়েজিং ওআর, রাজদ্রোহ। এখন রাজা একটি নয়, এক পাল রাজা, বিধানসভায় আর লোকসভায় যখন যাঁরা গদি পান তাঁরাই আমাদের রাজা। ভোট যাকে খুশি দেব, তা তো কেউ দেখতে যাচ্ছে না, কিন্তু কোনও দলকেই চটাতে পারব না মশাই।

বিনায়ক প্রশ্ন করল, দাদা কি বলেন?

দাদা অর্থাৎ আমি বললুম, শোন বিনায়ক। এখানে যাঁরা আড্ডা দিচ্ছেন এঁরা সবাই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, আর তোমরাও সাধু সজ্জন। তোমার মতন আমি পুরোপুরি সত্যসন্ধ নই, তবু এই বৈঠকে মনের কথা খুলে বলতে আপত্তি নেই। আমরা হচ্ছি সংসারী লোক, দুনিয়ার সঙ্গে রফা করে চলতে হয়। এই দেখ না, শ্রীযুক্ত সুধাবিন্দু

নন্দী বিধানসভায় দাঁড়াচ্ছেন। লোকটি যেমন মাতাল তেমনি লম্পট, দুটো খোরপোষের মামলা এখনও ঝুলছে। কিন্তু ইনি আমার এক জন বড় মক্কেল। যদি শোনেন যে আমি তোমাদের সাহায্য করছি তবে আমাকে আর কেস দেবেন না। তার পর মিস্টার রাধাকান্ত বাসু, লোকসভার ক্যাণ্ডিডেট। বিখ্যাত চোর আর ঘুষখোর। কিন্তু তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার ছোট মেয়ের বিবাহ স্থির হয়েছে। এখন যদি তোমার কথা রাখি তবে অমন ভাল সম্বন্ধটি ভেস্তে যাবে।

বিনায়ক বলল, জেনে শুনে চোর ঘুষখোরের ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবেন?

—তাতে ক্ষতিটা কি, মেয়ে তো সুখে থাকবে। তা ছাড়া আমার বেয়াই মিস্টার বাসু চোর বলে আমারও জামাইও যে চোর হবে এমন কথা সায়েন্সে বলে না। আবার দেখ, আমার বড় ছেলেটা কোনও গতিকে এম. এ. পাস করে বেকার বসে আছে আর কমরেডদের পাল্লায় পড়ে বিগড়ে যাচ্ছে। তার একটা ভাল পোস্টের জন্যে শ্রীগিরধারী লাল পাচাড়ী চেষ্টা করছেন। আমার বিশিষ্ট বন্ধু, কিন্তু চুটিয়ে কালো বাজার চালান আর পাকিস্তানে চাল আটা তেল কাপড় পাচার করেন। তুমি কি বলতে চাও তাঁকে চটিয়ে দিয়ে আমার ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করব?

বিনায়ক বলল, তবে আপনাদের কাছে কোনও আশা নেই?

—দেখ বিনায়ক, তোমরা যে মহৎ ব্রত নিয়েছ তাতে আমার অন্তত খুব সিমপ্যাথি আছে। তবে বুঝতেই পারছ, আমি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছি। চাও তো কিছু টাকা দিতে পারি, কিন্তু সেটা যেন প্রকাশ না হয়।

বিনায়ক বলল, থাক, টাকা এখন চাই না। আচ্ছা, আমরা চললুম, নমস্কার।

দু সপ্তাহ পরে বিনায়ক আবার আমার কাছে এল। আগের মতন বড় দল সঙ্গে নেই, মোটে তিন জন এসেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, খবর কি বিনায়ক, কাজ কেমন চলছে?

বিনায়ক বললে, শাস্ত্রে আছে, শ্রেয়স্কর ব্যাপারে বহু বিঘ্ন, তা অতি ঠিক। আমাদের দলের সাত জন ভেগেছে।

—বল কি! কোথায় গেল তারা?

—দু জন চাকরি নিয়ে দশটা পাঁচটা আপিস করছে, তাদের ফুরসত নেই। দুটি ছেলে বাপের ধমকে ঠাণ্ডা হয়ে লেখাপড়ায় মন দিয়েছে। সেই বিনয় ছোকরা, মেয়েদের যে গান শেখাত, প্রেমে পড়েছে, তারও কিছুমাত্র ফুরসত নেই। আরও দু জন আপনার ভাবী বেয়াই মিস্টার রাধাকান্ত বাসু আর মুরুব্বী গিরধারীলাল পাচাড়ীর দালাল হয়ে শিঙে মুখে দিয়ে গর্জন করছে—ভোট দিন, ভোট দিন। সেদিন সন্ধ্যার সময় একটা গুণ্ডা এসে আমাকে শাসিয়ে গেছে।

—খুব মুশকিলে পড়েছ দেখছি। খরচের জন্যে কিছু টাকা নেবে?

—তা দিন, কিন্তু দান নয়, কর্জ। আপনি যদি আমাদের সংঘের সহযোগিতা করতেন তবেই দান নিতে পারতুম। টাকাটা যত শীঘ্র পারি শোধ করে দেব।

—সে তো ভাল কথা, তোমার আত্মসম্মান বজায় থাকবে। কিন্তু দেশব্যাপী দুর্নীতি আর তার পোষক বড় বড় লোকদের সঙ্গে তুমি পেরে উঠবে কি করে? কোন্ দিন হয়তো গুণ্ডার হাতে প্রাণ হারাবে। আমি বলি কি, তোমার এই হোপলেস ব্রতটা ছেড়ে দাও। ভাল অথচ নিরাপদ সৎকার্য তো অনেক আছে, তারই একটা বেছে নাও—আর্ত-ত্রাণ, রোগীর সেবা, গরিবের ছেলেমেয়ের শিক্ষা, পতিতার উদ্ধার—

—দেখুন মশাই, সব কাজ সকলের জন্যে নয়, আমি নিজের পথ বেছে নিয়েছি, না হয় একলাই চলব। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যারা প্রথমে দাঁড়িয়েছিল তারা ক জন ছিল? অন্য নিরাপদ সৎকর্ম বেছে নেয় নি কেন? তারা প্রাণ দিয়েছে, আবার অন্য লোক তাদের স্থান নিয়েছে। আমার এই ব্রত হচ্ছে ধর্মযুদ্ধ, আমিই না হয় প্রথম শহিদ হব। দেখবেন, আমার পরে আরও অনেক লোক এই কাজে লাগবে, প্রথমে অল্প, তার পর দলে দলে। আচ্ছা, চললুম, নমস্কার।

দশ দিন পরে সকাল বেলা একটি ছেলে এসে বলল, বিনু-দা এই টাকার থলিটা আপনাকে দিতে বলেছেন। সাড়ে সাত টাকা কম আছে, ওটা আমিই এর পর শোধ করে দেব।

টাকা নিয়ে আমি বললুম, না না, বাকীটা আর শোধ দিতে হবে না। বিনায়কের খবর কি?

—কাল রাত থেকে হাসপাতালে আছেন, বাঁচবার আশা নেই। শেষ রাত্রে আমার সঙ্গে একটু কথা বলেছিলেন, আপনার ধার শোধ দেবার জন্যে। আজ সকাল থেকে আর জ্ঞান নেই। বড্ড টাকার টানাটানি ছিল, প্রায় এক মাস ধরে নামমাত্র খেতেন, অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। কাল সন্ধ্যাবেলা রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান, সেই সময় রাধাকান্ত বোসের মোটর তাঁকে চাপা দেয়।

হাসপাতালে যখন পেঁছিলুম তখন বিনায়ক মারা গেছে। তার দলের তিন জন উপস্থিত ছিল।

বিনায়ককে যে টাকা দিয়েছিলুম তার সমস্তই সে ফিরিয়ে দিয়েছে, সাড়ে সাত টাকা ছাড়া। আমার সাহায্যের মূল্য সেই সাড়ে

সাত। যদি দু-তিন হাজার তাকে দিতুম তাতেই বা সে কি করতে পারত? সে চেয়েছিল আন্তরিক সক্রিয় সাহায্য, তা দেওয়া আমার মতন লোকের পক্ষে অসম্ভব। বিনায়কের মহা ভুল, সে দুষ্কৃতদের বিনাশ করতে চেয়েছিল, যে কাজ যুগে যুগে অবতারদেরই করবার কথা। পাগলা বিনায়ক অনধিকার চর্চা করতে গিয়ে প্রদীপ্ত অনলে পতঙ্গের ন্যায় প্রাণ হারিয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের কথা, কিন্তু এরই নাম ভবিতব্য, আমাদের সাধ্য কি যে তার অন্যথা করি। নাঃ, আমাদের আত্মগ্লানির কারণ নেই।

১৮৭৯

যযাতির জরা

মহারাজ যযাতি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে বললেন, বৎস, পঁচিশ বৎসর আমি তোমার প্রদত্ত যৌবন উপভোগ করেছি, তুমি তার পরিবর্তে আমার জরার গুরু ভার বহন করেছ। আমার আর ভোগ-বিলাসে রুচি নেই। এখন বুঝেছি, কাম্য বস্তুর উপভোগে কামনা শান্ত হয় না, ঘৃতসংযোগে অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধি পায়, অতএব বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ করাই উচিত। আমার পাঁচ পুত্রের মধ্যে তুমি কনিষ্ঠ হলেও গুণে শ্রেষ্ঠ। তোমার ভ্রাতারা সকলেই স্বার্থপর, কেউ আমার অনুরোধ রাখে নি, কিন্তু তুমি দ্বিরুক্তি না করে তোমার নবীন যৌবন আমাকে দিয়েছিলে এবং তার পরিবর্তে আমার পলিত কেশ গলিত দন্ত লোল চর্ম আর দুর্বল ইন্দ্রিয়গ্রাম নিয়েছিলে। পুত্র, এখন জরা ফিরিয়ে দিয়ে তোমার যৌবন নাও, আমার রাজ্যও নাও। তুমি মনোমত সুন্দরী কন্যা বিবাহ কর, সুদীর্ঘ কাল জীবিত থেকে ঐশ্বর্য ভোগ কর। আমি সংসার ত্যাগ করে বনগমন করব।

এইখানে একটু পূর্বকথা বলা দরকার। যযাতির প্রথমা পত্নী দেবযানী, শুক্রাচার্যের কন্যা। তাঁর দুই পুত্র হয়েছিল। দ্বিতীয়া পত্নী শর্মিষ্ঠা, দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা। তাঁর তিন পুত্র, পুরু কনিষ্ঠ। শর্মিষ্ঠাকে যযাতি লুকিয়ে বিবাহ করেছিলেন, তা জানতে পেরে দেবযানী ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পিতার আশ্রমে চলে যান। শুক্রাচার্যের শাপে যযাতি অকালেই ষাট বৎসরের বৃদ্ধের তুল্য জরাগ্রস্ত হয়েছিলেন।

যযাতির বাক্য শুনে পুরু যুক্তকরে সবিনয়ে বললেন, পিতা,

আমাকে ক্ষমা করুন। একবার আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করেছিলাম, কিন্তু আপনার এই নূতন আজ্ঞা পালনের অভিরুচি আমার নেই, আপনি কৃপা করে প্রত্যাহার করুন। আমি যৌবন ফিরে চাই না, আপনিই তা ভোগ করতে থাকুন, আমি জরাতেই তুষ্ট।

যযাতি বললেন, পুত্র, তুমি আমাকে অবাক করলে। আমার অনুরোধে তুমি জরা নিয়েছিলে, কালক্রমে সেই জরা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তা থেকে মুক্ত হতে কেন চাও না তা আমি বুঝতে পারছি না।

পুরু বললেন, পিতা, আমাদের দুজনের বর্তমান অবস্থাটা বিচার করে দেখুন। যখন আপনি আমার যৌবন নিয়ে আপনার জরা আমাকে দিয়েছিলেন তখন আমার বয়স ছিল বিশ, আর আপনার ছিল ষাট। তার পর পঁচিশ বৎসর কেটে গেছে। এখন আপনি পঁয়তাল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়, আর আমি পঁচাশি বৎসরের স্থবির। আপনার প্রৌঢ়তার প্রতি আমার কিছুমাত্র লোভ নেই। জরাগ্রস্ত হবার পর থেকে আমি শাস্ত্রপাঠ যোগচর্চা আর অধ্যাত্মচিন্তায় নিরত আছি, ইন্দ্রিয়ভোগে আমার আসক্তি নেই, সর্ববিধ বিষয়তৃষ্ণা লোপ পেয়েছে। আমি দারপরিগ্রহ করি নি, পরমা সুন্দরী রমণী দেখলেও আমার চিত্তচাঞ্চল্য হয় না, অতি সুস্বাদ মাংস বা মিষ্টান্নেও আমার রুচি নেই। এই শান্তিময় অবস্থার আমি পরিবর্তন করতে চাই না। এখন আমি মোক্ষলাভের জন্য তপস্যা করছি, আপনার সঙ্গে বয়স বিনিময় করলে আমার পঁচিশ বৎসরের সাধনা পণ্ড হবে।

যযাতি এখন স্বাস্থ্যবান সবল মধ্যবয়স্ক, তাঁর চুল আর গোঁফে মোটেই পাক ধরে নি, দেখলে ত্রিশ বৎসরের যুবা বলেই মনে হয়। তাঁর পুত্র পুরু পঁচাশি বৎসরের বৃদ্ধ, মাথায় এখনও কিছু পাকা চুল অবশিষ্ট আছে, মুখে প্রকাণ্ড সাদা দাড়ি-গোঁফ। প্রৌঢ় যযাতি

তাঁর মহাস্থাবির পুত্রকে কিঞ্চিৎ ভয় করেন, লজ্জাও করেন। পুরুর কথা শুনে বললেন, পুত্র, আমি তোমার তপশ্চর্যার হানি করতে চাই না, কিন্তু আমার গতি কি হবে? এই যৌবনতুল্য দুর্মদ প্রৌঢ়ত্ব আর যে সহ্য হচ্ছে না।

পুরু বললেন, পিতা, কোনও স্থবির সদ্‌বিপ্র বা সৎক্ষত্রিয়কে আপনার প্রৌঢ়ি দান করুন, তার পরিবর্তে তাঁর জরা গ্রহণ করুন। আপনি মন্ত্রীকে আদেশ দিলে তিনি রাজ্যের সর্বত্র ঢক্কা বাজিয়ে ঘোষণা করবেন, প্রার্থীর অভাব হবে না, যোগ্যতমের সঙ্গেই আপনি বয়স বিনিময় করবেন। এখন আমাকে গমনের অনুমতি দিন, আমি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সংকল্প করেছি, তারই আয়োজন করতে হবে।

পুরু চলে গেলে পঞ্চাশ জন রাজভার্যা অন্তঃপুর থেকে এসে ব্যাকুল হয়ে যযাতিকে বেষ্টন করলেন। প্রথমা মহিষী দেবযানী সেই যে রাগ করে পিত্রালয়ে চলে গিয়েছিলেন তার পরে আর ফিরে আসেন নি। দ্বিতীয়া মহিষী শর্মিষ্ঠার বয়স এখন ষাট। তিনি কারও সঙ্গে মেশেন না, অন্তরালে থেকে ধর্মকর্মে কালযাপন করেন। পুনর্যৌবন লাভের পর যযাতি ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশটি বিবাহ করেছেন। এই সকল পত্নীদের বয়স এখন চল্লিশ থেকে পঁচিশ। এঁদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে প্রবীণা সেই পৃথুলাঙ্গী সপত্নীদের মুখপাত্রী হয়ে যযাতিকে বললেন, আর্যপুত্র, এ কিরকম কথা শুনছি? আপনি নাকি আপনার যৌবন পুরুকে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর পঁচাশি বৎসরের জরা নেবেন?

যযাতি বললেন, সেই রকমই তো ইচ্ছা। যৌবন আর আমার ভাল লাগে না, এখন বৈরাগ্য অবলম্বন করব। কিন্তু পুরু বেঁকে

দাঁড়িয়েছে, সে আর আগেকার মতন পিতৃভক্ত আজ্ঞাপালক পুত্র নয়, তার জরা ছাড়তে চায় না, যেন কতই দুর্লভ সামগ্রী। যদি নিতান্তই তাকে বশে আনতে না পারি তবে কোনও স্থবির ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কে আমার বয়স দিয়ে তাঁর জরা নেব।

রাজপত্নীদের মধ্যে যিনি কনিষ্ঠা সেই করঞ্জাক্ষী বললেন, মহারাজ, এই যদি আপনার অভিপ্রায় ছিল তবে আমাদের পাণিগ্রহণ করেছিলেন কেন? আপনি বহু পত্নীর স্বামী, নিজের যৌবন ভোগ করার পর আবার পুত্রের যৌবন ভোগ করেছেন। আপনার যৌবনে অরুচি হতে পারে, কিন্তু আমাদের তো হয় নি। আমাদের অনাথা করে যদি জরা গ্রহণ করেন তবে আপনার মহাপাপ হবে।

যযাতি বললেন, আমি মন স্থির করে ফেলেছি, আমার সংকল্প বদলাতে পারি না। তোমাদের সকলকেই আমি পত্নীত্ব থেকে মুক্তি দিলাম, প্রচুর অর্থও রাজকোষ থেকে পাবে। ইচ্ছা করলে আবার বিবাহ করতে পার।

করঞ্জাক্ষী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, মহারাজ, আপনার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে। আমরা সকলেই সন্তানবতী, কে আমাদের পত্নীত্বে বরণ করবে? সবৎসা ধেনুর যে মূল্য সবৎসা নারীর তা নেই।

যযাতি বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, তোমাদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। নূতন পতি যদি নাও জোটে তথাপি সুখে থাকতে পারবে। এখন যাও, আমার বিস্তর কাজ।

পুত্রের মত পরিবর্তনের জন্য যযাতি অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনও ফল হল না। তখন তাঁর আজ্ঞানুসারে রাজমন্ত্রী এই ঘোষণা করলেন।—ভো ভো বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন সদ্‌বংশজাত স্থবির

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ, অবধান করুন। কুরুরাজ যযাতির আর যৌবনভোগের ইচ্ছা নেই, কোনও জরাগ্রস্ত সৎপাত্রের সঙ্গে তাঁর বয়স বিনিময় করতে চান। শ্রীযযাতির বর্তমান বয়স পঁয়তাল্লিশ, পূর্ণ যৌবনেরই তুল্য। প্রার্থী স্থবিরগণ আগামী অমাবস্যায় পূর্বাহ্ণে হস্তিনাপুরে রাজভবনের চত্বরে উপস্থিত হবেন। মহারাজ স্বয়ং নির্বাচন করবেন, যাঁকে যোগ্যতম মনে করবেন তাঁর সঙ্গেই বয়স বিনিময় করবেন। তাঁর সিদ্ধান্তের কোনও প্রতিবাদ গ্রাহ্য হবে না।

নির্দিষ্ট দিনে প্রায় এক হাজার জরাগ্রস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হস্তিনাপুরে এলেন। এঁদের বয়স এক শ থেকে ষাট। কেউ কুঁজো হয়ে পড়েছেন, লাঠিতে ভর দিয়ে চলেন। কেউ দৃষ্টিহীন, অপরের হাত ধরে এসেছেন। কেউ চলতেই পারেন না, ডুলিতে চড়ে এসেছেন। যযাতির সংকল্পের সংবাদ পেয়ে দেবলোক থেকে দুই অশ্বিনীকুমার আর দেবর্ষি নারদও কৌতূহলবশে উপস্থিত হলেন, কিন্তু আত্মপ্রকাশ না করে অগোচরে রইলেন।

সমবেত প্রার্থিগণকে স্বাগত জানিয়ে যযাতি তাঁদের পরীক্ষা করতে যাচ্ছেন এমন সময় একদল বৃদ্ধা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। তাঁদের নেত্রী একজন বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণী। তাঁর মস্তক প্রায় কেশশূন্য, ললাটে বৈধব্যের প্রতিষেধক একটি প্রকাণ্ড সিন্দূরের ফোঁটা, পরিধানে রক্তবর্ণ পট্টবাস। ইনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, কুরুরাজ যযাতি, শাস্ত্রে আছে—যৌবন ধনসম্পত্তি প্রভুত্ব আর অবিবেকিতা, এর প্রত্যেকটি অনর্থকর, দুর্দৈবক্রমে আপনাতে চারটিই একত্র হয়েছে। এক যৌবনেই রক্ষা নেই, আপনি দুই যৌবন ভোগ করেছেন, সুতরাং যৌবনাক্রান্ত ধেড়ে-রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ কি প্রকার জীব তা ভালই জানেন। যে বৃদ্ধের সঙ্গে আপনি বয়স বিনিময় করবেন সে নিশ্চয় যুবতী ভার্যা ঘরে আনবে। তখন তার বৃদ্ধা পত্নীর কি দশা হবে ভেবে দেখেছেন কি?

যযাতি কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, হুঁ, আপনার আশঙ্কা যথার্থ। ওহে মন্ত্রী, এখনই ঘোষণা করে দাও—যাঁদের পত্নী জীবিত আছেন তাঁদের সঙ্গে আমি বয়স বিনিময় করব না। একটি করে স্বর্ণমুদ্রা প্রণামী স্বরূপ দিয়ে তাঁদের বিদায় কর।

যাঁদের বাদ দেওয়া হল তাঁরা প্রণামী নিলেন, কিন্তু কেউ চলে গেলেন না, রাজা কাকে মনোনীত করেন দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

যে পঙ্গু ব্রাহ্মণ ডুলিতে এসেছিলেন তিনি রাজার সম্মুখে এসে ডুলিতে বসেই বললেন, মহারাজের জয় হক। আমি মহাকুলীন বিপ্র কুলীরক, বয়স শত বর্ষ, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, আমার পাঁচ পত্নীই একে একে গত হয়েছেন। আমার তুল্য যোগ্যপাত্র কোথাও পাবেন না, অতএব আমার সঙ্গেই বয়স বিনিময় করুন।

নমস্কার করে যযাতি বললেন, দ্বিজোত্তম কুলীরক, আমি জরা কামনা করি, কিন্তু পঙ্গুত্ব চাই না। মন্ত্রী, এঁকে পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বিদায় কর।

তার পর এক বক্রপৃষ্ঠ বৃদ্ধ তাঁর দুই পৌত্রের হাত ধরে যযাতির কাছে এসে বললেন, মহারাজ, আমার নাম কিঞ্চুলুক, কার্তবীর্যার্জুনের বংশধর, বয়স আশি। চোখে ভাল দেখতে পাই না, অগাধ বিদ্যাবুদ্ধির জন্য লোকে আমাকে প্রজ্ঞাচক্ষু বলে। বহু পুত্র পৌত্র সত্ত্বেও আমি অসুখী, সকলেই আমাকে অবহেলা করে, সম্পত্তির লোভে আমার মৃত্যুকামনা করে। আপনার পরিপক্ক যৌবন পেলে আমি পুনর্বার দারপরিগ্রহ করে সুখী হতে পারব।

যযাতি বললেন, মহামতি কিঞ্চুলুক, আমি জরা চাই, কিন্তু আপনার প্রজ্ঞাচক্ষুতে আমার কাজ চলবে না। মন্ত্রী, পঞ্চ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে এঁকে বিদায় কর।

বহু প্রার্থী একে একে এসে রাজসম্মুখে নিজের নিজের গুণাবলী বিবৃত করলেন, কিন্তু যযাতি কাকেও তাঁর মহৎ দানের যোগ্য পাত্র মনে করলেন না। সহসা একটা গুঞ্জন উঠল, জনতা সসম্ভ্রমে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পথ ছেড়ে দিল। দুজন পক্ককেশ পক্কশ্মশ্রু বৃদ্ধ একটি অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী ললনার হাত ধরে রাজার সম্মুখে এলেন।

যযাতি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে আপনারা দ্বিজদ্বয়? এই বরবর্ণিনী সুন্দরী যাঁর আগমনে সভা উদ্ভাসিত হয়েছে ইনিই বা কে?

দুই বৃদ্ধের মধ্যে যিনি বয়সে বড় তিনি বললেন, মহারাজ, আমরা বিন্ধ্যপাদস্থ তপোবন বিল্বাশ্রম থেকে আসছি। মহাতপা ভল্লাতক ঋষির নাম শুনে থাকবেন, আমি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভীতক, আর কনিষ্ঠ এই হরীতক। এই রূপবতী কুমারী হচ্ছেন সুবর্তরাজ মিত্রসেনের কন্যা মনোহরা। প্রৌঢ় বয়সে মিত্রসেনের পত্নীবিয়োগ হলে তিনি বানপ্রস্থ গ্রহণের সংকল্প করলেন এবং পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করে একমাত্র কন্যার বিবাহের জন্য উদ্‌যোগী হলেন। কিন্তু এই মনোহরা বললেন, পিতা, বিবাহ থাকুক, আমিও বনে যাব, নইলে আপনার সেবা করবে কে? কন্যার অত্যন্ত আগ্রহ দেখে মিত্রসেন সম্মত হলেন এবং তাঁর কুলগুরু আমাদের পিতা ভল্লাতকের আশ্রমের নিকটে কুটীর নির্মাণ করে সেখানে বাস করতে লাগলেন। আমাদের পিতার অনেক বয়স হয়েছিল, কিছুকাল পরে তিনি স্বর্গে গেলেন। সম্প্রতি রাজা বসুমিত্রও পনরো বৎসর অরণ্যবাসের পর দেহত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি বললেন, হা, কন্যাকে অনূঢ়া রেখেই আমাকে যেতে হচ্ছে! গুরুপুত্র বিভীতক ও হরীতক, এর ভার তোমরা নাও, কালবিলম্ব না করে এর বিবাহ দিও, কিন্তু বৃদ্ধের সঙ্গে কদাচ নয়, বৃদ্ধপতিতে আমার কন্যার রুচি নেই। রাজার মৃত্যুর পর

আমরা মহা সমস্যায় পড়লাম। আমরা দুজনেই বৃদ্ধ, সে কারণে মনোহরার মনোমত পাত্র নই। এমন সময় ভাগ্যক্রমে আপনার ঘোষণা শুনলাম, তাই সত্বর এখানে এসেছি। মহারাজ, সকল বিষয়েই আমি এই কন্যার যোগ্য পাত্র, আমার সঙ্গেই আপনার বয়স বিনিময় করুন, তা হলে আমাদের বিবাহে কোনও বাধা থাকবে না।

হরীতক উত্তেজিত হয়ে বললেন, মহারাজ, আমার দাদার প্রস্তাব মোটেই ন্যায়সংগত নয়। আমি ওঁর চাইতে রূপবান ও বিত্তবান, মনোহরার সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধানও কম, ওর ত্রিশ, আমার ষাট, আর দাদার পঁয়ষট্টি। আমি এখনই যোগ্যতর পাত্র, মহারাজের যৌবন পেলে তো কথাই নেই।

বিভীতক ধমক দিয়ে বললেন, তুই চুপ কর মূর্খ। জ্যেষ্ঠের পূর্বে কনিষ্ঠের বিবাহ হতেই পারে না।

যযাতি বললেন, রাজকন্যা, তোমার অভিমত কি? তুমি যাকে চাও তাকেই আমার যৌবন দেব। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে কাকে যোগ্যতর মনে কর?

মনোহরা বললেন, দুজনেই সমান।

যযাতি বললেন, সুন্দরী, তুমি আমাকে বড়ই সমস্যায় ফেললে, এই বিভীতক আর হরীতকের মধ্যে আমিও কোনও ইতরবিশেষ দেখছি না। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর।

নিজের কুচকুচে কালো বাবরি চুলে হাত বুলিয়ে আর রাজকীয় মোটা গোঁফে চাড়া দিয়ে যযাতি বললেন, যৌবন তো আমার রয়েইছে, বেশ পরিপুষ্ট যৌবন, তা যদি দান না করে রেখেই দিই? আমিই যদি তোমাকে বিবাহ করি তা হলে কেমন হয় মনোহরা?

বিভীতক আর হরীতক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এ কি রকম কথা মহারাজ! আপনি ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করেছেন যে আপনার যৌবন অন্যকে দান করবেন, এখন বিপরীত কথা বলছেন কেন?

সমবেত বৃদ্ধদের কয়েক জন চিৎকার করে হাত নেড়ে বললেন, মহারাজ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে আপনি রৌরব নরকে যাবেন। আমাদের ডেকে এনে বঞ্চনা করবেন এত দূর আস্পর্ধা!

জনতা থেকে নিনাদ উঠল—চলবে না, চলবে না।

ব্যাপার গুরুতর হচ্ছে দেখে নারদ আর অশ্বিনীকুমারদ্বয় আত্মপ্রকাশ করলেন। যযাতি সসম্ভ্রমে তাঁদের পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দিতে গেলেন, কিন্তু নারদ বললেন, মহারাজ, ব্যস্ত হয়ো না, উপস্থিত সংকট থেকে আগে মুক্ত হও।

যযাতি বললেন, দেবর্ষি, আমার মাথা গুলিয়ে গেছে, আপনিই বলুন এখন আমার কর্তব্য কি।

নারদ বললেন, তুমি সত্যভ্রষ্ট হয়েছ। পুরুকে ডাক, সেই তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যবস্থা করবে।

যযাতির আহ্বানে পুরু জনসভায় এলেন। পূজনীয়গণকে বন্দনা করে বললেন, পিতা, আমাকে আবার এর মধ্যে জড়াতে চান কেন? আমার যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান এখনও সমাপ্ত হয় নি, যজ্ঞান্ত স্নান না করেই আপনার আদেশে এসেছি। বলুন কি করতে হবে।

যযাতি নীরবে রইলেন। নারদ বললেন, রাজপুত্র, তোমার পিতার কিঞ্চিৎ চিত্তবিকার হয়েছে, তাঁর সংকল্প সিদ্ধির ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। এই সভায় উপস্থিত বৃদ্ধগণের মধ্যে কে যোগ্যতম, কার সঙ্গে যযাতি বয়স বিনিময় করবেন তা তুমিই স্থির কর।

পুরু প্রশ্ন করলেন, ওই বিদ্যুদ্‌বল্লরী তুল্য ললনা যাঁর দুটি হাত দুই বৃদ্ধ ধরে আছেন, উনি কে?

নারদ বললেন, উনি স্বর্গত সুবর্তরাজ মিত্রসেনের কন্যা মনোহরা। ওই দুই বৃদ্ধ ওঁর পিতার গুরুপুত্র, বিভীতক ও হরীতক। ওঁরা দুজনেই মনোহরার পাণিপ্রার্থী, যযাতির যৌবনও ওঁরা চান। কিন্তু তোমার পিতা বড় সমস্যায় পড়েছেন, কার সঙ্গে বয়স বিনিময় করবেন তা স্থির করতে পারছেন না।

পুরু বললেন, সমস্যা তো কিছুই দেখছি না, আমি এখনই মীমাংসা করে দিচ্ছি। রাজকন্যা, ওই দুই বৃদ্ধের মধ্যে কাকে যোগ্যতর মনে কর?

মনোহরা বললেন, দুজনেই সমান।

একটু চিন্তা করে পুরু বললেন, বরবর্ণিনী মনোহরা, তোমার সহিত নিভৃতে কিছু পরামর্শ করতে চাই। ওই অশোক তরুর ছায়ায় চল।

অশোকতরুতলে কিছুক্ষণ আলাপের পর পুরু সকলের সমক্ষে এসে বললেন, পরমারাধ্য পিতৃদেব, ত্রিলোকপূজ্য দেবর্ষি, দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয়, এবং সমবেত ভদ্রগণ, অবধান করুন। আজ সহসা আমার উপলব্ধি হয়েছে, পিতার আজ্ঞা পালন না করে আমি অপরাধী হয়েছি। এখন উনি আমাকে ক্ষমা করুন, ওঁর যৌবনের পরিবর্তে আমার জরা গ্রহণ করুন। এই রাজকুমারী মনোহরা আমাকেই পতিত্বে বরণ করবেন।

নারদ আর দুই অশ্বিনীকুমার বললেন, সাধু সাধু! জনতা থেকে ধ্বনি উঠল, রাজা যযাতির জয়, যুবরাজ পুরুর জয়! বিভীতক আর হরীতক বিরস বদনে নিঃশব্দে প্রস্থান করলেন।

যযাতি মৃদুস্বরে আপন মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, ছি ছি ছি, এই যদি করবি তবে সেদিন অমন তেজ দেখিয়ে আমার কথায় 'না' বললি কেন? এত লোকের সামনে ধাষ্টামো করবার কি দরকার ছিল?

দুই অশ্বিনীকুমার বললেন, মহারাজ যযাতি, রাজপুত্র পুরু, আমরা এখনই অস্ত্রোপচার করে তোমাদের জরা-যৌবন পরিবর্তিত করে দিচ্ছি, অস্ত্রভাণ্ড আমাদের সঙ্গেই আছে।

নারদ বললেন, তোমাদের কিছুই করতে হবে না, পিতা-পুত্রের পুণ্যবলে বিনা অস্ত্রেই পরিবর্তন ঘটবে।

পুরু তাঁর পিতাব চরণ স্পর্শ করলেন। পুরুর মস্তকে করার্পণ করে যযাতি বললেন, পুত্র, আমার যৌবন তোমাতে সংক্রমিত হক, তোমার জরা আমাতে প্রবেশ করুক।

তৎক্ষণাৎ বিনিময় হয়ে গেল।

১৮৭৯